সিপাহী যুদ্ধের ট্র্যাজেডী

আনিস সিদ্দিকী

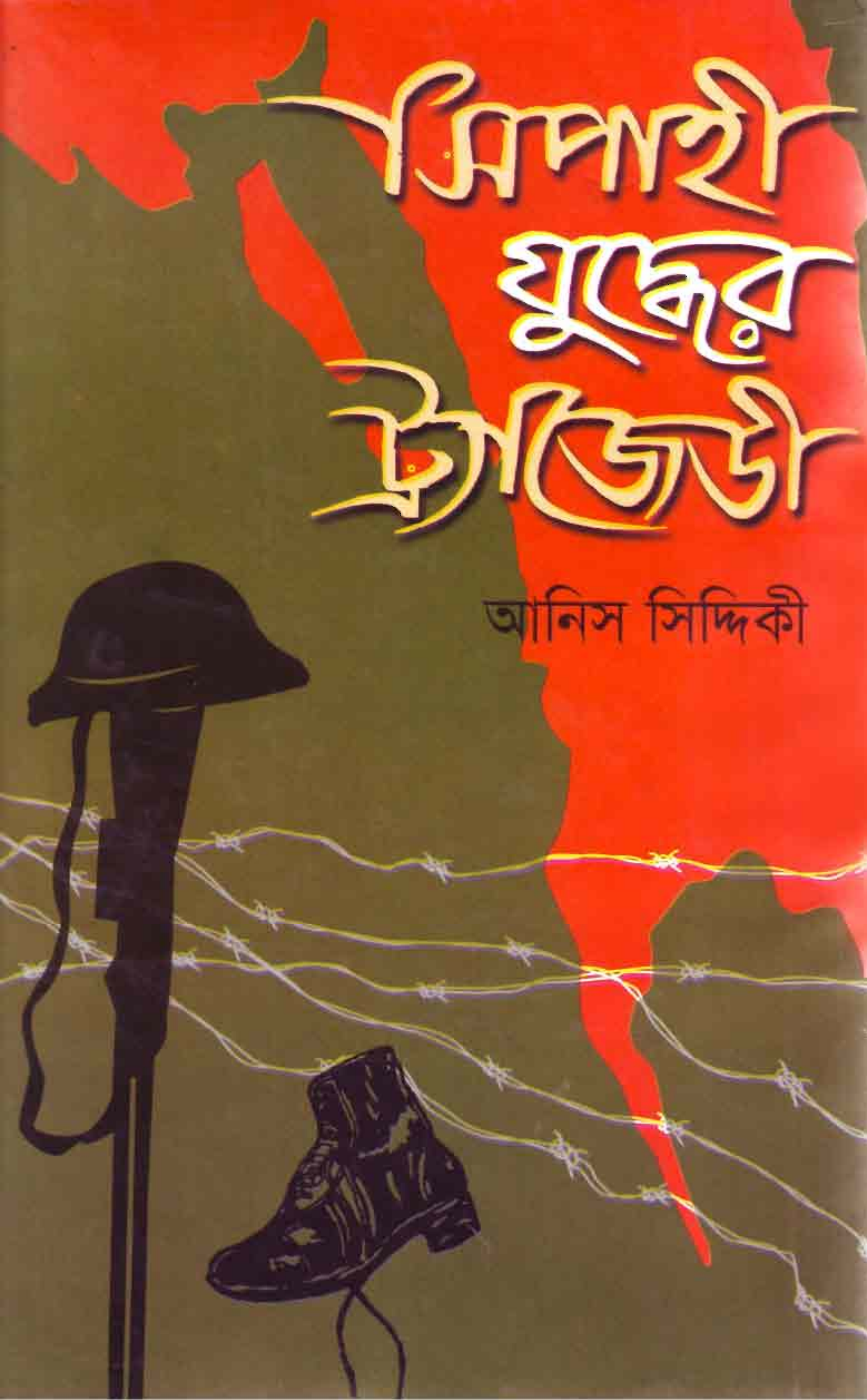

সিপাহী যুদ্ধের ট্র্যাজেডী

আনিস সিদ্দিকী

এক

—স্যার, এই বাচ্চাগুলোকে কি ফাঁসি না দিলেই নয় ? এমন কোনো মারাত্মক অপরাধ তো ওরা করেনি! বয়সের দিক দিয়েই নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমার মনে হয়, শাস্তির মাত্রা কমিয়ে দেয়া যায়।

—না, না, তা হয় না। এরা কালসাপ। এদের বাঁচিয়ে রাখা নিরাপদ নয়। আজকের অপরাধ বেশি না হলেও আগামীতে ওরা বাপ-দাদার চেয়েও বড় অপরাধ করবে। শত্রুর শেষ রাখা ঠিক নয়। এই বয়সেই দল বেঁধে কোম্পানি রাজত্বের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়েছে, ইংরেজ হত্যার হুমকি দিয়েছে, এটাকে আপনি কম অপরাধ বলতে চান ? এর চেয়েও কম অপরাধে আমরা হাজার হাজার লোককে ফাঁসি দিয়েছি।

—তারা তো বয়স্ক, স্যার! তারা যেটুকু করেছে, বুঝে শুনে করেছে। এরা করেছে হুজুগে। একেবারে বাচ্চা ছেলে। কাঁচাবুদ্ধি।

—আপনি এদের ছেলেমানুষ বলছেন ? ইউরোপে অবশ্য এদের বালক বলা হয়। কিন্তু এদেশে এরা এই বয়সে সংসার করে। মা-বাপ ওদের বিয়ে দেয়। দয়া-দাক্ষিণ্য দেখানো বিচারকের কাজ নয়। আপনার অভিজ্ঞতা কম, তাই স্নেহ বেশি। আমরা সামরিক আদালতের বিচারক। অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়াই আমাদের কর্তব্য।

বললেন বারানসীর সামরিক আদালতের কম্যান্ডিং অফিসার। সেদিন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো কচি বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হয়েছিলো একজন নবীন বিচারকের। ওদের ফাঁসি না দেওয়ার জন্যে তিনি অনুরোধ করেছিলেন কম্যান্ডিং অফিসারকে। কিন্তু কম্যান্ডিং অফিসার তার অনুরোধ রক্ষা করেন নি। বাচ্চাগুলোকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিলো।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা দিল্লীর ক্ষমতা ফিরে পেয়ে হত্যা করেছিলো এদেশের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে। প্রথম দিকে তারা বিচারের ধার ধারেনি। সন্দেহ হলেই নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলো সম্মানীয় ব্যক্তিদের। অত্যাচার করেছিলো অমানবিক পন্থায়। পরবর্তীকালে অবশ্য স্থানে স্থানে আদালত গঠন করা হয়েছিলো। কিন্তু বিচার হয়নি সেখানে। শত্রুতাবশে কেউ কারো বিরুদ্ধে মিথ্যে রিপোর্ট করলেই তাকে হাজির করা হতো বিচারকের সামনে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ ছিলো না। সাক্ষীর কথামতো ফাঁসি দেওয়া হতো অভিযুক্তকে। সত্যিকার বিচার তখন হতো না। বিচারের বাণী সে সময় নীরবে-নিভৃতে কাঁদতো।

সুসভ্য ইংরেজ কর্মকর্তাদের এই সময়কার আচরণের বিবরণ জানা যায় নানাভাবে। কোনো কোনো ইংরেজ অফিসার কিংবা সরকারী কর্মচারী চিঠি লিখতেন দেশে। তাদের

বীরত্ব কিংবা নৃশসংতার চিত্র তুলে ধরতেন সে-সব চিঠিতে। আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসী বুঝতো, ভারতীয় বিদ্রোহী সিপাহীরা ইংরেজদের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি। এদেশে ইংরেজদের জীবনের নিরাপত্তার অভাব নেই। বরং ভারতবাসীরা ইংরেজদের হাতে দমিত হচ্ছে। তাদের মানসম্মান বিষয়-সম্পত্তি এবং জীবন-মরণের অধিকার সম্পূর্ণভাবে চলে গেছে ইংরেজ কর্মকর্তাদের কবলে। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে ভারতবর্ষের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

আবার কোনো কোনো ইংরেজ অফিসার ডায়েরীতে লিখতেন সে সময়ের বীভৎস ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পরবর্তীকালে অনেকে বই আকারেও সে সব ঘটনা প্রকাশ করেছিলেন। সে আমলের প্রখ্যাত সাংবাদিক ইউলিয়াম রাসেল ইংরেজ অফিসারদের অমানবিক নৃশংসতার কাহিনী বিবৃত করেছেন তার 'ডায়েরী অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে। একস্থানে তিনি বলেছেন, 'একজন সামরিক অফিসারের সাথে আজ আমার আলাপ হলো। তিনি মেজর রেনোনের অধস্তন কর্মচারী। তিনি গর্বের সাথে আমাকে জানালেন, স্থানীয়দের হত্যার ব্যাপারে আমরা আপোষহীন। সামনে পেলেই হলো। বিচার-বিবেচনা করে মারার সময় আমাদের নেই। নির্বিচারে হত্যা না করলে ওদের কমাবো কি করে ? আবার যদি বিদ্রোহ করে ? এবার তো আমরা প্রাণে বেঁচে গেছি। জয়লাভ করেছি। পরবর্তীতে তা হবে না। ওরা আর ইংরেজদের প্রতি দয়া দেখাবে না। হত্যা করবে নির্বিবাদে। তাই আমরা খতম করেছি শক্তিবানদের। শক্ত-সমর্থ, তেজী-নির্ভীক আর শিক্ষিত-অশিক্ষিত দেশপ্রেমিকদের আমরা রাখবো না। গতকাল যখন রাস্তা দিয়ে কুচকাওয়াজ করে আসছিলাম তখন বারোজন পথচারী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলো। বুঝেছিলাম ওরা আমাদের ঘৃণা করছে। ইংরেজ বিদ্বেষ ওদের অন্তরে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলা বন্ধ করে বন্দী করেছিলাম সেই হিংসুটে লোকগুলোকে। অন্যদের সামনেই গাছের ডালে তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। গ্রামবাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো। বিচার-সালিস করে ওদের ফাঁসি দেওয়া যেতো না। সময়ও লাগতো যথেষ্ট। ওসব ঝামেলার মধ্যে আমরা আপাততঃ যাচ্ছি না। সন্দেহ হলেই হলো। গত দুদিনে এইভাবে চলার পথেই বিয়াল্লিশ জনকে ফাঁসি দিয়েছি। এতো গেলো চলার পথের বিবরণ। মেজর রেনোন দিনশেষে যেখানে দলবল নিয়ে আস্তানা গাড়তেন তার আশপাশের গ্রামগুলোর অবস্থা হতো আরো করুণ ও হৃদয় বিদারক। সাথের লোকজন দিয়ে গ্রামগুলোকে তিনি ঘিরে ফেলতেন। গ্রামবাসীরা যাতে বেরুতে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করতেন। তারপর আদেশ দিতেন আগুন জ্বালানোর। গ্রামগুলো পুড়ে ছাই না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন অদূরে।"

এমন হৃদয় বিদারক নৃশংসতা কি সুসভ্য, হৃদয়বান ব্যক্তিরা চিন্তা করতে পারেন ? আজকের দিনে ভাবাও যায়না এমন অনেক ঘটনা সেদিন ঘটেছে। আর বিস্ময়ে অবাক হতে হয়, সে সব ঘটিয়েছে সুসভ্য ইংরেজ জাতি।

এলাহাবাদেও সে সময় ঘটেছিলো অনুরূপ ঘটনা। একজন ইংরেজ কর্মকর্তার বিলেতী আত্মীয়-স্বজন হয়তো সিপাহী বিদ্রোহের খবর পেয়ে শঙ্কিত হয়েছিলো। তার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলো। হয়তো চাকরি ছেড়ে দেশে ফেরার প্রস্তাব

দিয়েছিলো। সে চিঠির জবাবে বৃটিশ অফিসারটি যে পত্র দিয়েছিলো তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি। পত্রটি সে সময়েই ছাপা হয়েছিলো একটি বিলেতী পত্রিকায়। ভারতবর্ষে অবস্থানরত ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে আশ্বস্ত করাই ছিলো সে পত্র খবরের কাগজে প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। সেদিন প্রবাসী ইংরেজদের জীবনের নিরাপত্তার অভাব যে ছিলো না, বরং তারাই ভারতীয়দের নিরাপত্তা কিভাবে বিঘ্নীত করেছিলো সে চিত্র ফুটে উঠেছিলো উক্ত কর্মকর্তার চিঠিতে। সে সময় তাঁকে এলাহাবাদের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছিলো। তিনি কোন্ ধরনের ন্যায়বিচার করেছিলেন তার স্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়।

—"শোনো, আমাদের নিয়ে তোমরা অনর্থক চিন্তা-ভাবনা করছো। আমরা এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমরা ভারতীয়দের ভয় করি না। ওদের কাছে আমরা যম। নেটিভদের বিচারের জন্যে এলাহাবাদে যে কমিশন গঠন করা হয়েছে, আমি তার চেয়ারম্যান। এখন বুঝতে পারছো, আমি কতোবড় ক্ষমতার অধিকারী। এরা আমাদের মারবে ? ওদের জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়সীমা এখন থেকে আমরা নির্ধারণ করবো। আমাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমাদের গোচরে যারা আসবে তারা কিছুতেই রেহাই পাবে না। এতোদিন পরে বিশ্বাসঘাতা করার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ আমাদের হাতে এসেছে। এ সুযোগ আমরা হেলায় নষ্ট করতে পারি না। মৃত্যুই তাদের একমাত্র শাস্তি।"

"এলাহাবাদে আসার ঘটনা তোমাকে জানাই। এবারকার ভ্রমণটা হয়েছে খুবই উপভোগ্য। আমরা এসেছিলাম স্টীমারে চড়ে। অনুগত শিখ সৈন্যরা এসেছিলো নদীর পাড় দিয়ে হেঁটে। পথে আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিলো তাদের উপর। অবশ্য একটা কামান স্টীমারে ছিলো। আমার পুরাতন দোনালা বন্দুকটা সাথে নিয়েছিলাম। সেটার সাহায্যে সামনে পড়া কয়েকজন স্থানীয়কে আমি হত্যা করেছিলাম। প্রতিহিংসায় তখন ছিলাম আমি উন্মাদ। ওই লোকগুলোর কোনো অপরাধ ছিলো কিনা সে বিচার-বিবেচনা আমার মাথায় আসেনি। স্টীমার ছেড়ে যখন গ্রামের পথ দিয়ে চলেছিলাম তখন হত্যা করি ওই গ্রামবাসীদের। শুধু যে গ্রামবাসীদের হত্যা করা হয়, তা নয়, গ্রামগুলোকেও জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো। পোড়া মাটির নীতি গ্রহণ করেছিলাম আমরা। গ্রামের ঘরবাড়ি, খাদ্য-শস্য, বাগ-বাগিচা যখন দাউ দাউ করে জ্বলতো আর তার শিখা যখন উর্ধ্ব আকাশে উঠতো তখন চারি দিক থেকে তপ্ত হাওয়া এসে তার ভয়ঙ্কর রূপকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলতো। বিশ্বাসঘাতকদের দূরবস্থা দেখে আমরা তৃপ্তি অনুভব করতাম। প্রতিশোধ গ্রহণের আনন্দে হতাম আত্মহারা।'

এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ ইংরেজদের লেখা থেকেই পাওয়া যায়।

অবশ্য ইংরেজদের মধ্যেও অনেক হৃদয়বান অফিসার ছিলেন। অন্যায়ভাবে নিরপরাধ গ্রামবাসীদের উপর দৃষ্টান্তহীন জুলুম তাঁরা সহ্য করতে পারেন নি। অনেক সময় মনের আবেগ লিখে রেখেছেন দু'চার কথায়। সে সময়কার কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জন ওয়াল্টার লিখেছেন, "আমাদের চলার পথে যে সব গ্রাম পড়লো সেগুলো জনশূন্য। গোরা সিপাহীরা আগেই গ্রামবাসীদের মেরে ফেলেছে। ঘর-বাড়ি, গাছ- গাছড়া পুড়িয়ে

ছাই করেছে। চারিদিকে নিদারুণ শূন্যতা বিরাজ করছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সে সব জনপদে গৃহস্থরা মনের সুখে ঘরকন্যা করতো। বৃদ্ধেরা করতো ছোটদের খবরদারী। চঞ্চল শিশু-কিশোরদের চপলতায় আনন্দ মুখরিত হতো ছায়াঘেরা শান্ত গ্রামগুলো। মেয়েরা পর্দা-পুশিদার মধ্যে অতিবাহিত করতো সংসার জীবন। আজ কিছুই নেই। নেই প্রাণের স্পন্দন। ঘর নেই, বাড়ি নেই, বাগান নেই, পশু নেই, পাখি নেই—শুধু নেই, আর নেই। গ্রামদেশে এমন নির্জনতা, এমন শূন্যতা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। আছে শুধু পচা দুর্গন্ধময় জলাশয়, পোড় খাওয়া কালো কালো ভিটেমাটি আর মাংসচর্মহীন প্রাণীর অস্থি। থেকে থেকে ব্যাঙের গোংরানী কানে আসে। রাতে শোনা যায় ভয়ার্ত শেয়ালের আর্ত চীৎকার। গভীর রাতে ভেসে আসে নাম না জানা পোকা-মাকড়ের একটানা করুণ সুরের ঐক্যতান। একটা উগ্র দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটায়। বড় বড় গাছের শক্ত ডালে এখনো গ্রামবাসীদের প্রাণহীন গলিত দেহগুলো ঝুলছে। ছিঁড়ে পড়েছে কিছু কিছু। শূকর আর শেয়ালেরা সে সব নিয়ে মহা উৎসবে মগ্ন। মানবজীবন নিয়ে এমন জঘন্য খেলা খেলতে কেউ কোনোদিন দেখেছে কি না আমি জানি না। আমার একার নয়, আমার সঙ্গীদের হৃদয়েও যে শূন্যতা, যে বেদনা, যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তার স্মৃতি সারাজীবন অম্লান হয়ে থাকবে। সে অচিন্তনীয় দৃশ্য ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।”

জন ওয়াল্টারের এই লেখাটির সেদিনের নির্মমতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা থেকেই ইংরেজদের অত্যাচারের সামগ্রিক ছবি অনুমান করা যায়। ওয়াল্টার না বললেও ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, তাছাড়া সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ ছিলো এন্ডফিল্ড রাইফেলের কার্তুজ। শূকর আর গরুর চর্বি দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে রাজী না হওয়ার কারণে যেহেতু সংঘাত বেঁধেছিলো, সেহেতু গোরা সৈন্যরা কোনো গ্রামে ঢুকে প্রথমে গ্রামবাসীদের দু'ভাগ করত। মুসলমানদের দেহ শূকরের চামড়া দিয়ে মুড়ে নদীতে ফেলে দিতো। কাছে নদী না থাকলে শূকরের চর্বিতে ভিজিয়ে নেওয়া হতো মুসলমানদের দেহ। তারপর ঝুলানো হতো ফাঁসিতে। আর হিন্দুদের ফাঁসি দেওয়ার আগে মুখে পুরে দেওয়া হতো গরুর চর্বি।

এইভাবে উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের জাত মারার পর হত্যা করা হতো। অথচ এরাই সুসভ্য বলে সে যুগেও জাহির করতো নিজেদের। প্রতিহিংসা তাদের কতো নিচে নামিয়ে দিয়েছিলো তা আজকের দিনে অনুমান করাও কঠিন। ইংরেজ জাতি তাদের জাত ভাইয়ের সেদিনকার নৃসংসতায় আজ লজ্জা অনুভব করে। সেদিনও সবাই এটা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরাই লিখে গেছেন কিছু কিছু। ইতিহাস লেখার জন্যে সে সব গ্রন্থই আজকের মাল-মশলা।

অবশ্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা অমানবিক আচরণের জন্যে প্রাথমিক দোষ চাপাতে চায় স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীদের স্কন্ধে। তাদের মতে, নৃশংসতা আগে দেখিয়েছিলো বিদ্রোহীরা। নিরপরাধ ইংরেজ নরনারীদের হত্যা করেছিলো তারাই প্রথমে। পরে ক্ষমতা ফিরে পেয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিলো ইংরেজ কর্মকর্তারা। কিছুটা বাড়াবাড়ি তারা করেছিলো প্রিয়জনদের হারানোর বেদনায় আর ক্ষমতা প্রদর্শনের আনন্দে।

এই কিছুটা বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে 'ইণ্ডিয়া এমপায়ার' নামক গ্রন্থে মার্টিন লিখেছেন, "পাঁচ মাস পরে যেদিন শিখ সৈন্যদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইংরেজ বাহিনী দিল্লী শহর পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলো তার আগেই ভারতীয় সিপাহীরা শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। নিরপরাধ সম্ভ্রান্ত শহরবাসীরাই শুধু ছিলো শহরে। তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে পড়েছিলো। প্রাণভয়ে জড়ো হয়েছিলো বড় বড় বাড়িতে। রাস্তা-ঘাটে কিংবা বাইরে খুব কম সংখ্যক লোকই ছিলো। তাঁদের কোনো অপরাধ ছিলো না। যারা ইংরেজ সেনাদের ভয় করার কোনো কারণ খুঁজে পায়নি, শুধু তাঁরাই বাইরে ছিলো। আমাদের সৈন্যরা শহরে ঢোকার সাথে সাথে যেন অমানুষ হয়ে গেলো। যাকে সামনে পেলো তাকেই সঙ্গীনের আঘাতে হত্যা করলো। আপন-পর, শত্রু-মিত্র, গুণী-নির্গুণ, সৎ-অসৎ কিছুই দেখলো না। নির্বিবাদে হত্যা করলো। বিচার বিবেচনার প্রয়োজন তারা অনুভব করলো না। বন্দী করে বিচার সালিসের ঝুঁকি নিলো না।

তারপর তারা প্রবেশ করতে লাগলো ঘরে ঘরে। সভ্রান্ত ব্যক্তিদের ঘরেই গেলো প্রথমে। চল্লিশ-পশ্চাশ জন করে লোক পেলো অধিকাংশ ঘরে। প্রাণের ভয়ে তাঁরা লুকিয়েছিলো। কেউই রেহাই পেলো না। সবাইকে হত্যা করা হলো। এতে সহজেই অনুমান করা যায়, কতো নিরস্ত্র মানুষকে সেদিন নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। এই লোকগুলো তো বিদ্রোহীদের দলে ছিলো না! তারা নেহায়েত শান্তি-প্রিয় গোবেচারা শহরবাসী। এরা ভেবেছিলো, যেহেতু বিদ্রোহের সাথে তাঁদের কোনো সংশ্রব নেই, তাই তাঁদের কিছু বলা হবে না। অনর্থক ঘর ছেড়ে, শহর ছেড়ে, সিপাহীদের সাথে যাওয়ার কী দরকার ? তাঁরা যাই ভাবুক না কেন, আমাদের সৈনিকেরা তাঁদের চরমভাবে আঘাত করেছিলো। নির্মমভাবে করেছিলো হত্যা।"

"বিদ্রোহীরা শহর ত্যাগের সময় শতাধিক আহত সহকর্মীকে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। অসুস্থতার কারণে তারা শহর ছাড়তে পারেনি। শিবিরেই রয়ে গিয়েছিলো। ক্যাপ্টেন হটসনের নেতৃত্বে আমাদের যে বাহিনী সেখানে গিয়েছিলো তারা তাদের প্রতিও করুণা দেখায়নি। সে সব অসহায় পঙ্গু রোগ পাণ্ডুর লোকগুলোকে তারা একটা একটা করে হত্যা করেছিলো। মনের ঝাল মিটিয়েছিলো করুণা প্রার্থীদের উপর।"

"জহির দেহলবী নামক একজন লেখক 'দস্তন-ই-গফর' নামক গ্রন্থে দিল্লীর হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে,—'ইংরেজ সৈন্যেরা দিল্লী নগরীর রাস্তায় ভারতীয়দের দেখামাত্রই গুলী করতো। সে ব্যাপারে দোষী আর নির্দোষ বলে কোনো বিচার-বিবেচনা ছিলো না। শহরের খ্যাতিমান সাহিত্যিক মুহম্মদ আমীন পঞ্জকুশ এবং ইমাম বখ্শ ক্ষণজন্মা পুরুষ। মানুষ হিসেবেও তাঁরা ছিলেন অতুলনীয়। এমন সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অতীতে দিল্লীতে জন্মায়নি। সন্তান সন্ততিসহ তাঁদের নেওয়া হয় রাজঘাটে। কুচসেলানের অধিবাসীদেরও পাইকারীভাবে ধরে নেওয়া হয় সেখানে। সবাইকে একত্রে গুলী করে ইংরেজ সিপাহীরা। প্রায় দেড় হাজার লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হয় যমুনার নীল পানিতে। এমনকি গোরও দেওয়া হয়নি কাউকে। কুচসেলানের শিশু ও মহিলাদের ধরতে পারেনি পাষণ্ডেরা। ইংরেজ বাহিনী তাদের এলাকায় প্রবেশের সাথে

সাথে মুসলিম নারীরা সন্তানসহ ঝাঁপিয়ে পড়েন কুয়োর মধ্যে। শিশু ও মহিলাদের লাশে ভরে ওঠে মহল্লার কুয়োগুলো। ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে সেদিন মুসলিম পর্দানশীন মহিলারা স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন এই অনভিপ্রেত মৃত্যু।'

"উর্দু সাহিত্যের দিকপাল কবি গালিব তখনও বেঁচে ছিলেন। তিনি সহ্য করতে পারেন নি এই অমানুষিক হত্যাযজ্ঞ। তিনি 'দেস্তমবু' পুস্তকে লিখেছিলেন, 'দিল্লী শহর জনমানবহীন সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। উর্দু বাজার নিশ্চিহ্ন। উর্দু ভাষাভাষীও নির্মূল। কাদের জন্য আমি লিখবো ? কে উর্দু পড়বে ? দিল্লী আজ মহাশ্মশান। দোকান-পাট, বাজার-ঘাট, নহর-ফোয়ারা সবই বিধ্বস্ত। অবশ্য হিন্দু মহাজনেরা বেঁচে আছে, কিন্তু কোনো ধনী মুসলমান জীবিত নেই। রক্তের মহাসমুদ্রের মাঝখানে আমি একাকী দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাজার হাজার প্রিয় বন্ধু আর ভক্ত পাঠক আজ পরপারে। আমি কার সাথে কথা বলবো ? কার কাছে প্রকাশ করবো আমার মর্মবেদনা ? কে আমাকে সহানুভূতি জানাবে ? কে দেবে আমাকে সান্তনা ? আমার দুঃখে এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলার মতো একজন লোকও বেঁচে নেই দিল্লীতে। জানিনা, আমাকে আরো কী দেখতে হবে ?"

ইংরেজ বাহিনীর নৃশংসতার আরো হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যায়। সেদিন ইংরেজ সেনাপতি আর সেপাইরা যা করেছিলো তা নজীরবিহীন। তারা পৃথিবীময় রটনা করেছিলো ভারতীয় বিদ্রোহী সিপাহীদের নির্মমতার মনগড়া কাহিনী। বিদ্রোহী বাহিনীর হাতে কিছুসংখ্যক ইংরেজ নিহত হয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু ইংরেজ অত্যাচারের সাথে তার তুলনা হয় না। ভারতীয়রা করেছিলো স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে। দেশকে স্বাধীন করার উদগ্র বাসনায়। ইংরেজ কর্মকর্তাদের অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে তারা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলো। প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলো অন্যায় অবিচারের। দেশোদ্ধারের নামে তারা করেছিলো বিদ্রোহ। হত্যা করেছিলো ইংরেজ কর্মকর্তাদের। তারা আদর্শ দেশপ্রেমিক হলেও শিক্ষিত ছিলো না। আর ছিলো নেতৃত্বের অভাব। কিন্তু ইংরেজদেরতো ছিলো সবকিছু। তারা সভ্যতার নামে, ন্যায় বিচারের নামে, ভারতের আপামর জনসাধারণের উপর নির্বিচারে যে অত্যাচার আর ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলো তা কোনো যুক্তিতে আসে না। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে ইংরেজরা এদেশে এসে ব্যবসার নামে শাসকদের ছলনায় ভুলিয়ে অধিকার করেছিলো শাসন ক্ষমতা। অত্যাচার আর নিপীড়ন করেছিলো সভ্রান্ত ব্যক্তিদের উপর। অমানবিক ব্যবহার করতো বেতনভুক সেনাবাহিনীর সাথে। তাই তারা বিদ্রোহ করেছিলো। দেশ স্বাধীন করতে চাওয়ায় যদি দোষ হয়, তবে সে অপরাধে আমেরিকা থেকে শুরু করে আফ্রিকা পর্যন্ত আজকের সকল স্বাধীন দেশের দেশপ্রেমিকরা অপরাধী। কারণ সবাইকে স্বাধীনতার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হয়েছে। কোনো পরাশক্তিই স্বেচ্ছায় কোনো কলোনী ছেড়ে যায়নি। না চাইতেও দেয়নি স্বাধীনতা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশকেও সংগ্রাম করতে হয়েছিলো বৃটিশের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোথাও কোনো বিদেশী সরকার এমনি নির্দয়ভাবে নিরপরাধ নাগরিকদের হত্যা করেনি। সেসব ক্ষেত্রে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিলো সামরিক শক্তির মধ্যে, কিংবা রাজনৈতিক অঙ্গনে। সাধারণ নিরপরাধ লোকদের উপর অত্যাচার করে বিদ্রোহ দমন করা যায় না। বরং বেড়ে যায়। আঘাতে মানুষ শক্ত হয়। ভীতুরা হয় নির্ভীক। আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দুই

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের বীর সেনানীদের পর্যদস্ত করার পর ইংরেজরা ভারতবাসীদের উপর নৃশংস অত্যাচার করেছিলো কেন ? কেন তারা শহরে-বন্দরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো ? শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ব্যবসায়ী-চাকরিজীবী, মহাজন-শ্রমিক—এককথায় সর্বশ্রেণীর শক্ত-সামর্থ যুব সমাজকে তারা কেন পাইকারী ভাবে হত্যা করেছিলো ?

উত্তরে বলা যায় ঃ

পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশ বছর পরে উপমহাদেশে সত্যিকার সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় ১৮৫৭ সালে। সাগরপারের শেতাঙ্গ অত্যাচারী শাসকদের নাগপাশ থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেয় ইংরেজ-পুষ্ট হিন্দু-মুসলিম দেশীয় সিপাহীরা। তাদের সেই ঐতিহাসিক জীবন-সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ছিলো জমিদার-মহাজন, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, মৌলবী-পুরোহিত সর্বশ্রেণীর অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত দেশপ্রেমিকের। মীরাটে ও দিল্লীতে ইংরেজদের পরাজিত করে বিদ্রোহী সিপাহীরা ঐতিহ্যবাহী মোগল শাহী বংশের শেষ প্রতিনিধি সম্রাট বাহাদুর শাহ'কে তাদের নেতা হিসেবে বরণ করে নেয়। বসায় তাঁকে লাল-কেল্লার 'দেওয়ান-ই-খাসে'র সিংহাসনে। সাথে সাথে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। স্বাধীন ভারতের ঝান্ডা উড়তে থাকে সর্বত্র। প্রচণ্ড সাড়া জাগে সমগ্র অঞ্চলে। নতুন জীবনের স্পন্দন শুরু হয় ভারতীয়দের হৃদয়ে।

দিল্লী দখলের খবর পেয়েই ফিরোজপুর ও মুজাফফরগরেও সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। তারপরই বিদ্রোহ দেখা দেয় নৌসেরা, হতমর্দান, অযোদ্ধা, উত্তর প্রদেশ, এটোরা, মঈনপুরী, ঝরকী, মথুরা, লখনৌ, বেরিলী, শাহজাহানপুর, কানপুর, এলাহাবাদ, ফতেপুর, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে। সিপাহীদের সাথে বহুস্থানে যোগ দেয় স্বাধীনতাকার্মী জনসাধারণও। অধিকাংশ শহরে বিদ্রোহীরা জেলখানা ভেঙে ভারতীয় কয়েদীরের মুক্ত করে। লুঠ করে ট্রেজারী। হস্তগত করে সরকারী অর্থসম্পদ।

ইতিপূর্বে ইংরেজরা যেসব দেশীয় রাজন্যবর্গকে ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতাহীন করেছিলো, তারাও দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করে দেশপ্রেমিকদের। বিদ্রোহের মাত্র এক বছর আগে অযোধ্যার অগণিত তালুকদার নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তারাও শামিল হয় বিদ্রোহীদের দলে। কৃষিজীবীরাও যোগ দেয় তালুকদারদের সমর্থনে।

বেরিলীর প্রভাবশালী জমিদার খান বাহাদুর খাঁ নিজেকে সম্রাট বাহাদুর শাহের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করেন। তার দেখাদেখি বিজনোর রাজ্যের মাহমুদ খাঁও দিল্লীর স্বাধীন সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। জগদীশপুরের কুনওয়ার সিং, ঝান্সির রানী, বুন্দেলা খণ্ডের নবাব এবং শাহগড়ের রাজাও সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রতি যেমনি আনুগত্য দেখান তেমনি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন বিদ্রোহী সিপাহীদের। কিন্তু কানপুরের নানাসাহেব দিল্লী সম্রাট বাহাদুর শাহের আনুগত্য স্বীকার না করে নিজেকে স্বাধীন পেশওয়া বলে ঘোষণা করেন। তাকে অনুসরণ করেন অযোধ্যা ও রোহিলা খণ্ডের জমিদারগণ। তারাও নিজেদের স্বাধীন নরপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। পৃথকভাবে তাঁরা সংগাম চালান। সে কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে মোকাবিলা করা ইংরেজদের পক্ষে সহজ হয়েছিলো।

ইংরেজরা পাঁচ মাস পরে দিল্লীর ক্ষমতা ফিরে পেয়েই কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লীকে মহাশ্মশানে পরিণত করেছিলো। শিখ সিপাহীদের সক্রিয় সাহায্যে ও সহযোগিতায় বিদ্রোহ দমনের নামে নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিলো ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে। উপমহাদেশের অধিবাসীদের উপর করেছিলো নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার। নিরপরাধ শিশু বৃদ্ধ, নর-নারী, জ্ঞানী-নিবোধ কেউ রেহাই পায়নি তাদের মরণথাবা থেকে।

ভারতীয় সিপাহীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সেদিন পরাজিত হয়েছিলো কেন ? কেমন করে ইংরেজরা আবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিলো ? ভারতীয়দের উপর নিষ্ঠুরতা দেখানোর সাহস তারা কিভাবে সঞ্চয় করেছিলো ? এককথায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরাজয়ের মূল কারণ কি ? কেন তাদের এই ব্যর্থতা ?

দেশপ্রেমিকদের ব্যর্থতার মূলে ছিলো সংহতির অভাব। বিদ্রোহীদের কর্মপন্থা, সময়সূচী ও নেতৃত্ব ছিলো সামঞ্জস্যহীন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিংবা নীতি নির্ধারণী সংস্থা না থাকলে বিদ্রোহ-বিপ্লবে জয়লাভ সহজসাধ্য হয় না। শুধু দেশপ্রেম নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগে স্বাধীনতা অর্জন অসম্ভব। সেজন্যে প্রয়োজন জনবলের সাথে অস্ত্রবল ও নেতৃবৃন্দের সঠিক সিদ্ধান্ত। সিপাহী বিদ্রোহে সেটার অভাবই ছিলো সবচেয়ে প্রকট। ফলে একই সময়ে ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্রোহ শুরু হতে পারেনি। একই নীতি ও কর্মপন্থাও গৃহীত হয়নি সব এলাকায়। সংযোগ রক্ষা করেনি কেউ কারো সাথে।

মীরাট থেকে আগত বিদ্রোহী দেশপ্রেমিক সিপাহীরা অশীতিপর বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে বাধ্য করেছিলো নেতৃত্ব গ্রহণে। লালকেল্লার দেওয়ান-ই-খাসের সিংহাসনে আরোহণ করে প্রকৃত স্বাধীন সম্রাটের মতো আচরণ করতে। স্বাভাবিকভাবে সম্রাটও নিজেকে সর্ব ভারতীয় নেতা হিসাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন। আদেশ-নিষেধ দিয়েছিলেন ঐতিহ্যবাহী মোগল সম্রাটদের মতো। কিন্তু একে তো তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল চরিত্রের অধিকারী, তদুপরি তাঁর নেতৃত্ব সঠিকভাবে মেনে নেয়নি কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। পৃথকভাবে তারা ইংরেজদের মোকাবিলা করেছিলো। তাতে লাভ হয়নি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করলে শত্রুদের সুবিধাই হয়। তেমনি হয়েছিলো ১৮৫৭ সালেও।

নানাসাহেব ছিলেন পেশওয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পোষ্যপুত্র। তার আসল নাম ধন্দুপন্থ বাহাদুর। কানপুরের মারাঠা সম্প্রদায়ের নেতা বা পেশাওয়া ছিলেন বাজীরাও। তিনি ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে বার্ষিক আটলক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে অবসর জীবন যাপন করেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কোম্পানির ভাতার উপর নির্ভরশীল হতে হয় তাকে। কিন্তু তার মৃত্যুর পর পোষ্যপুত্র নানাসাহেবকে ইংরেজরা বার্ষিক ভাতা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। লর্ড ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতির আওতায় তাকে বঞ্চিত করা হয় বাজীরাওয়ের বৃত্তি থেকে। ফলে ভয়ানকভাবে ইংরেজ বিদ্বেষী হয়ে পড়েন নানাসাহেব। মারাঠারা তাকে নেতা হিসাবে মান্য করলেও অর্থাভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পারেননি তিনি হারানো রাজ্য উদ্ধার করতে। কিন্তু মীরটের ও দিল্লীর সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে তিনি হন আশান্বিত। যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান ইংরেজদের বিরুদ্ধে। কিন্তু আনুগত্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন সম্রাট বাহাদুর শাহের প্রতি। নিজেই হতে চান স্বাধীন পেশওয়া। মারাত্মক ভুল করেন তিনি এভাবেই। ঠিক একই ভাবে ভুল করেন ঝান্সির রাণী, তাতিয়া তোপী ও কুনওয়ান সিং। তারা সবাই নিজের এলাকায় সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রথম ধাক্কাতেই পরাজিত করেছিলেন ইংরেজদের। কিন্তু দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে না চলায় বিচ্ছিন্ন ঘটনায় পরিণত হয় তাদের যুদ্ধ কৌশল। ইংরেজদের পক্ষে সহজ হয় পৃথকভাবে তাদের পরাজিত করা। দুর্বল হন তাতে সম্রাট বাহাদুর শাহ। হীনবল হয় কেন্দ্রীয় শক্তি।

একমতে, এক নেতৃত্বে যুদ্ধ করলে এমনটি হতো না। স্বল্প সংখ্যক ইংরেজের পক্ষে একই সাথে সবদিক সামলানো ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। সে ক্ষেত্রে পরাজয় ছিলো তাদের অনিবার্য। দেশীয় রাজন্যবর্গের এসব ভুল-ক্রুটি বাদেও ইংরেজরা ছিলো অনেক পারদর্শী। তারা একসাথে যেমন সর্বত্র যুদ্ধ আরম্ভ করেনি, সবাইকে তেমনি করেনি শত্রুতে পরিণত। বিশেষ করে, ভারতের অন্যতম সেরা সামরিক সম্প্রদায় শিখদের সাথে তারা মিতালী পাতিয়ে নেয়। হাত করে নেয় একটা সুসংবদ্ধ সাহসী সামরিক সম্প্রদায়কে। মাত্র দশ বছর আগে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে তারাই শিখদের পরাজিত করেছিলো। অধিকার করেছিলো পাঞ্জাব। অথচ সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত সিপাহী বাহিনীর বিরুদ্ধে ইংরেজরা সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিলো সেই শিখদের। সে সময়ে শিখ সৈন্যেরা ইংরেজদের সমর্থন না করলে বিদেশীদের ক্ষমতা ছিলো না ভারতীয় সৈন্যদের পরাজিত করে দিল্লীর পতন ঘটানো। ভারতীয় শিখ সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতাই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিলো।

বিদ্রোহী সিপাহীদের আরেকটা মারাত্মক ভুল হয়েছিলো। তারা দিল্লী অধিকার করেছিলো ঠিকই। পাঁচ মাসের মতো স্বাধীনভাবে সরকারী কাজকর্ম চালিয়েছিলো, তাও ঠিক। কিন্তু বৃটিশ সেনাবাহিনী যাতে আবার কোনোভাবে দিল্লী অবরোধ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করেনি, এতোটুকু সাবধান হয়নি। ফলে, শিখ সৈন্যদের সহায়তায় ইংরেজদের পক্ষে দিল্লী নগরী অবরোধ করা সহজ হয়। সত্যিকথা বলতে কি, শহরের মধ্যে আটকে পড়ে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। শহর রক্ষার্থে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে অবতীর্ণ

হতে বাধ্য হয় তারা। পক্ষান্তরে ইংরেজরা শহরের বাইরে ইচ্ছেমতো জায়গায় ঘাটি করে। আক্রমণ চালায় তাদের সুবিধামত ফ্রন্ট থেকে। এই সময় যদি অন্যান্য প্রদেশ কিংবা সেনানিবাস থেকে স্বাধীনতাকামী সৈন্য বাহিনী এসে ইংরেজদের উপর পেছন থেকে হামলা চালাতো, তবে তারা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হতো। কিন্তু তেমনটি হয়নি। সমন্বয়ের অভাবের কারণেই হতে পারেনি। অবশ্য ব্রিটিশ বাহিনীর শৃঙ্খলা, সামরিক দক্ষতা, পরিকল্পনার দূরদর্শিতা এবং উন্নত ধরনের নেতৃত্ব তাদের বিজয়লাভে সহায়তা করেছিলো।

কানপুরের কথা

কানপুর রাজ্যহারা ও ইষ্ট কোম্পানির বৃত্তি থেকে বঞ্চিত নানাসাহেব, দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী সিপাহী কর্তৃক দিল্লী অধিকারের খবর পেয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠেছিলেন। হাজার চেষ্টা করেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত কিছুই করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই সময় হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে। সম্রাট বাহাদুর শাহর প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে, মোগল প্রাধাণ্য অস্বীকার করেও তিনি মারাঠা শক্তি পুনজাগরণের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ইচ্ছা করেন। মারাঠারা নানাসাহেবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার জন্যে পীড়া-পীড়ি করেছিলো। ইংরেজপুষ্ট মারাঠা সিপাহীরা নানাসাহেবের প্রতি সমর্থন জানানোর কথা গোপনে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো। কিন্তু সম্রাট বাহাদুর শাহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বা বিদ্রোহী সিপাহীদের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন মনে করেনি। নানাসাহেব মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে চাননি কানপুর রাজ্যকে। তিনি ভেবেছিলেন, দিল্লী থেকে ইংরেজদের যেমন তাড়িয়ে দেওয়া গেছে, কানপুর থেকেও তেমনি যাবে। মোগলদের অধীনে নতুন করে যাওয়ার দরকার নেই।

চারদিক থেকে মারাঠারা তাঁকে উত্তেজিত করলেও প্রথমে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামে যেতে চাননি। সে ক্ষমতাও তার ছিলো না। তাই তিনি কানপুরের ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল হুইলারকে জানান,—'মীরাট ও দিল্লীর মতো আমরাও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোষণা করতে চাই। তবে তোমরা যদি স্বেচ্ছায় অস্ত্র-অস্ত্র আমাদের হাতে তুলে দিয়ে চলে যেতে চাও, তবে কোনো ক্ষতি করা হবে না। কানপুর ছেড়ে তোমাদের চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

কানপুরের ইংরেজ শিবিরে স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ মিলিয়ে ছিলো আটশোর মতো। এর আগে দিল্লীতে ও মীরাটে প্রভাবশালী ইংরেজ কর্মকর্তাদের নিহত হওয়ার খবর পৌঁছে গিয়েছিলো কানপুরে। তাই সেখানকার সেনাপতি জেনারেল হুইলার সাহস করলেন না নানাসাহেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে। কিন্তু তার প্রস্তাব মেনে নিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র হাতছাড়া করতেও চাইলেন না। তিনি ভাবলেন, দলবল নিয়ে হয়তো এলাহাবাদের দিকে যাওয়া যায়। যোগদান করা যায় সেখানকার ইংরেজ শিবিরে। কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে গেলে পথের উপায় কি হবে? সারা ভারত ইংরেজদের বিরুদ্ধে খ্যাপা।

স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত। ইংরেজ নিধনে তৎপর। তাদের উপর দীর্ঘ দিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে তারা মরিয়া, পাগলপ্রায়। এমতাবস্থায় খালি হাতে কানপুর ত্যাগ করা উচিত হবে না।

সিপাহীদের চাপ থাকা সত্ত্বেও নানাসাহেব ইংরেজ শিবির আক্রমণ করতে সাহস পেলেন না। মোকাবিলা করতে চাইলেন না ইংরেজ সেনাপতির। কিন্তু তার আদেশ অমান্য করার অপরাধে ইংরেজ শিবিরে খাদ্যদ্রব্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। তাদের আবদ্ধ করে রাখলেন একটা স্বল্প পরিসর স্থানে। নিরুপায় হয়ে জেনারেল হুইলার দলবলসহ সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। মওজুদ খাদ্য ফুরিয়ে এলো। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় তারা ক্রমান্বয়ে কাহিল হয়ে পড়লো। মাস খানেকের মধ্যে আড়াইশ'র মত ইংরেজ নরনারী মারা গেলো। বাধ্য হয়ে জেনারেল হুইলার নানাসাহেবের প্রস্তাব মেনে নিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র, গোলার-বারুদ তার হাতে উঠিয়ে দিয়ে কানপুর ত্যাগ করতে রাজী হলেন। বিনিময়ে চাইলেন শুধু জীবনের নিরাপত্তা।

নানাসাহেব রাজী হলেন। এলাহাবাদে যাওয়ার জন্যে চব্বিশখানা দেশীয় নৌকার ব্যবস্থা করা হলো। খাদ্যদ্রব্যও সঙ্গে দিতে সম্মত হলেন তিনি। পথের নিরাপত্তার জন্যে দিতে চাইলেন কিছু হালকা অস্ত্র। আপোষেই হলো সবকিছু। নির্ভয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে জেনারেল হুইলার সহচরদের নিয়ে হাজির হলেন সতীচওরার ঘাটে। সেখানেই মওজুত ছিলো নৌকাগুলো। ভালোয় ভালোয় হলো সব কিছু। অবরুদ্ধ হওয়ার বিয়াল্লিশ দিন পরে ইংরেজরা মুক্তির আস্বাদ পেলো, কিন্তু নানাসাহেবের বাহিনীর মতি-গতি, চাল-চলন তাদের ভালো লাগলো না। শঙ্কিত করে তুললো ইংরেজদের। মুক্তির আনন্দ থেকে হলো তারা বঞ্চিত। দীর্ঘদিন অভুক্ত শুষ্ক মুখগুলো আরও শুকিয়ে গেলো। আগেই চলনশক্তি হারিয়েছিলো অনেকে। ডুলি এবং পাল্‌কিতে করে আনা হলো তাদের ঘাটে। একে একে ইংরেজরা উঠতে লাগলো দেশীয় নৌকায়। সবাই প্রায় উঠে গেছে, কয়েকজন মাত্র উঠতে বাকি। এমনি সময় ঘটলো এক অমানবিক ব্যাপার। এখানেও বিচারের বাণী নীরবে কাঁদলো। বিশ্বাসঘাতকতা আর নিষ্ঠুরতার এক অকল্পনীয় কলঙ্কময় ইতিহাস সৃষ্টি হলো সতীচওরার ঘাটে।

ঘাটের পাড়ে ইংরেজদের ছেড়ে যাওয়া কামান প্রচণ্ড হুঙ্কারে গর্জে উঠলো। এলোপাথাড়ি গোলা পড়তে লাগলো নৌকাগুলোর উপরে। মাঝিরা নৌকায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। আগুনের শিখায় এবং কামানের প্রচণ্ড গোলার আঘাতে মারা গেলো প্রায় সকল ইংরেজ নর-নারী। এক কলঙ্কময় ঘৃণ্য ইতিহাস সৃষ্টি হলো কানপুরে। যে সামান্য সংখ্যক ইংরেজ তখনো বেঁচেছিলো, তাদের বন্দী করে রাখা হলো 'বিবিঘর' নামক একটা অল্প পরিসর গৃহে। তাতেও তারা রেহাই পেলোনা। কয়েকদিনের মধ্যেই সে-সব বন্দী নিরস্ত্র লোকগুলোর উপর চললো অস্ত্র পরীক্ষা। তরবারির আঘাতে হত্যা করা হলো সেসব বন্দীদের।

বিবিঘরের এই কাপুরোষচিত হত্যাযজ্ঞ, তার আগে ইংরেজ শিবিরে খাদ্যদ্রব্য ও পানি বন্ধ এবং সতীচওরার চরম বিশ্বাসঘাতকতা ভারতবাসীদের উন্নত মস্তক বিশ্ববাসীর

কাছে, মানবতার কাছে অবনত করেছে। কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছে ভারতবাসীর মুখে। অবশ্য এখন প্রশ্ন উঠেছে, ঐতিহাসিকেরা এখন গবেষণা করছেন, এই নিষ্ঠুর আদেশ প্রদানের জন্যে সত্যিকারভাবে দায়ী কে ছিলো ? নানাসাহেব নিজেই কি এমন নিষ্ঠুর আদেশ দিয়েছিলেন ? না অন্য কোনো ক্ষিপ্ত বিবেকহীন ব্যক্তির নির্দেশে ঘটেছিলো এমন হৃদয় বিদারক ঘটনা।

আদেশ যারই থাকুক, যার ঘাড়েই আজ দোষ চাপানো কেন, ঘটনাটা যে ভারতবাসীর চরিত্র কলঙ্কিত করেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অপযশের হাত থেকে আমরা রেহাই পেতে পারি না। ইংরেজরা ভারতবাসীর উপর অমানবিক নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো বলে আমরা ধিক্কার দেই। সমগ্র পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ তাদের গালমন্দ করে, কিন্তু ইংরেজরা বলে, ভারতীয় বিদ্রোহী সিপাহী এবং কর্মকর্তারা নিষ্ঠুরতার পরিচয় আগেই দিয়েছিলো। তাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না হলেও আমরা যে মোটেও বাড়াবাড়ি করিনি তা ঠিক নয়।

কানপুরের মর্মান্তিক সংবাদ হাওয়ায় ভর করে চলে গেলো এলাহাবাদে। সেখানকার ইংরেজরা তখন নিরাপদ, সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। তারা কানপুরের হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ নেওয়ার মনস্থ করলো। জেনারেল হ্যাবলক ও জেনারেল নীল-এর উপর পড়লো কানপুর পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব। তাঁরা দু'হাজার বাছাই করা দুঃসাহসী দুর্ধর্ষ সৈন্য ও দুরপাল্লার আটটি কামান নিয়ে যাত্রা করলেন কানপুর অভিমুখে।

খবর পৌঁছে গেলো কানপুরে। নানাসাহেব তখন স্বাধীন পেশওয়ার মতো শাসন করছেন কানপুর। সৈন্য সামন্ত সংগৃহীত হয়েছে হাজার হাজার। ইংরেজদের কামান-বন্দুক আর গোলা-বারুদে তারা সুসজ্জিত। স্বাধীনতার উন্মাদনায় বলীয়ান। ইংরেজদের পাল্টা আক্রমণের গোপন খবরে তারা ভীত হলো না। বরং আগত ইংরেজ বাহিনীকে নাস্তা-নাবুদ করার নিখুঁত পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করলো।

পরিকল্পনা মোতাবেক নানাসাহেবের প্রধান সেনাপতি জওয়ালা সিং তিন হাজার বাছাই করা সেনা ও বারোটা কামানে নিয়ে যাত্রা করলেন এলাহাবাদের পথে। উদ্দেশ্যে শত্রু বাহিনীকে কানপুরের ধারে কাছে আসতে না দেয়া। পথেই রুদ্ধ করা তাদের অগ্রযাত্রা।

ফতেপুরে নিরাপদ স্থানে শিবির গাড়লেন সেনাপতি জওয়ালা সিং। কারণ, ইংরেজ বাহিনী তখন কাছাকাছি এসে গিয়েছিলো। ব্যস্ততার সাথে প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন তিনি।

১২ই জুলাই। ইংরেজ বাহিনীও পৌঁছে গেলো ফতেপুরে। মুখোমুখি হলো দু'পক্ষ। জওয়ালা সিং-এর অশ্বরোহী বাহিনী প্রথম আক্রমণ করলো ইংরেজ বাহিনীকে। ইংরেজরা তখনো গুছিয়ে নিতে পারেনি। প্রথমে মার খেলো কিছুটা। তারপর প্রচন্ডবেগে কামানের গোলা ছুড়তে লাগলো মারাঠা বাহিনীর উপর। মারাঠারাও কামান চালালো। কিন্তু পেরে উঠলো না সুশিক্ষিত ইংরেজ বাহিনীর সাথে। প্রাণ নিয়ে পালালো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। সাহস বেড়ে গেলে ইংরেজ বাহিনীর। বীর বিক্রমে এগিয়ে চললো তার কানপুরের দিকে।

নানাসাহেব নিজেই পথে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে ইংরেজ আক্রমণ প্রতিহত করার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করছিলেন। গোপন আচমকা হামলায় ইংরেজদের নিঃশেষ করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। সেটা হয়তো সম্ভবও ছিলো। কারণ জেনারেল নীলের নেতৃত্বে ছিলো তখন মাত্র হাজার খানেক সৈন্য। চলতি পথে অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে মার খাওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না তার। কিন্তু গোপন খবর পেলেন তিনি। প্রথমে অবশ্য ঘাবড়ে গেলেন। বুঝলেন, মাত্র বারো তেরো'শ সৈন্য নিয়ে পথিমধ্যে পাঁচ হাজার দেশগতপ্রাণ সৈন্যের মোকাবিলা করা সহজসাধ্য নয়।

আবার ভাবলেন, ভয় পেলে চলবে না। পেছন হটারও উপায় নেই। আরও সৈন্যের অপেক্ষায় বসে থাকাও নিরাপদ নয়। বিদ্রোহী মারাঠা বাহিনীর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রচুর সম্ভাবনা। তাই বাধ্য হয়ে শত্রু বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার চিন্তা করলেন জেনারেল নীল। পরিকল্পনা তৈরি করলেন সেইভাবে। পরিকল্পনা মোতাবেক ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এগুতে আদেশ দিলেন তার বাহিনীকে। ভাবলেন, একসাথে সবাই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ঠিক হবে না। শত্রুকে প্রথম দলের সাথে নিয়োজিত রেখে অন্যান্য দল দিয়ে চারদিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে নাস্তা-নাবুদ করতে হবে তাদের। করলেনও তাই। নানাসাহেব নিজেই ছিলেন সৈন্য পরিচালনায়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়েও তিনি পেরে উঠলেন না পারদর্শী স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ সৈন্যের সাথে। সম্মুখ সমরে আগে তিনি কখনও অবতীর্ণ হননি। তার বাহিনীও ছিলো না ইংরেজদের মতো সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী। শুধু দেশাত্মবোধে এবং মনের জোরে যুদ্ধের জয়লাভ করা যায় না। নানা সাহেব সেটা বুঝলেন হাড়ে হাড়ে। বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়ালেন তিনি পথ থেকে। চলে গেলেন বিঠুরের উদ্দেশ্যে। মাত্র তিন ঘণ্টায় কানপুরের ভাগ্য পরীক্ষা শেষ হলো। বিজয়ীর বেশে ইংরেজ বাহিনী প্রবেশ করলো কানপুরে। জেনারেল নীল প্রথমে গেলেন বিবিঘরে। বন্দী ইংরেজদের মুক্ত করতে চাইলেন তিনি। বিজয়ের আনন্দের অংশীদার করতে চাইলেন হতভাগ্য বন্দী দেশী ভাই বোনদের।

কিন্তু মর্মন্তুদ সে দৃশ্য। বিবিঘরের দরজা খুলে তিনি দেখলেন, তাজা রক্তের উপর ভাসছে নিহত বন্দীদের লাশ। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরেই হয়তো তরবারির আঘাতে কেউ হত্যা করেছে অসহায় বন্দীদের। কান্নায় ভেঙে গেলো তার বুক। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠলো জেনারেল নীলের অন্তরে। প্রতিশোধ গ্রহণের কঠোর প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি। আরম্ভ হলো ভারতীয় হত্যার লোমহর্ষক অভিযান। দুষ্ট লোকেরা তখন শহরছাড়া। দেশপ্রেমিক সৈন্য বাহিনীও তখন বিঠুরে। আত্মগোপন করেছে অনেকে। শহরে আছে শুধু নিরীহ নিরপরাধ গোবেচারা লোকগুলো। বিদ্রোহী বাহিনীর সাথে পালিয়ে জীবনকে আরও দুর্বিষহ করতে চায়নি তারা। নিজেদের ভেবেছিলো নিরাপদ। কিন্তু জেনারেল নীলের রাগ গিয়ে পড়লো তাদের উপরে। প্রতিশোধের নামে নিষ্ঠুরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন তিনি।

শুধু কানপুরে নয়, যেখানে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো সেখানেই ইংরেজ বাহিনী নির্মম হয়েছিলো। সিপাহী বিদ্রোহের একশত বছর আগে ইংরেজরা শাসন-ক্ষমতা হাতে

পেয়েছিলো। ভারতবাসীর উপর সামান্য কারণে কখনো কখনো বিনা কারণে অন্যায় অত্যাচার করতো, বিচারের ধার তারা বড় একটা ধারতো না। খেয়াল খুশীই ছিলো তাদের বিচার বিবেচনার মাপকাঠি। কিন্তু সকল অন্যায় অত্যাচারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো ১৮৫৭ সালের নির্মমতা। বিদ্রোহীরা ক্ষমতা হাতে পেয়ে কিংবা পাওয়ার জন্যে সর্বত্রই কিছু কিছু ইংরেজকে হত্যা করেছিলো। কোথাও কোথাও নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিলো। সে যুগে সেটা ছিলো অচিন্তনীয় ব্যাপার। ভারতবাসীরা গোবেচারা, সহজে প্রত্যাঘাত করে না, এটাই জানা ছিল ইংরেজদের। কিন্তু তারা জানতো না অত্যাচারিতরা একবার খেপে গেলে, তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলে, কিংবা প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা হাতে পেলে তারা সব লণ্ডভণ্ড করতে পারে। অত্যাচারীদের চাইতেও ভয়ানক হতে পারে। হয়েছিলো সেটা ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালে। বিচার বিবেচনা তাদের তখন লোপ পেয়েছিলো। ন্যায় অন্যায় বোধ তারা হারিয়ে ফেলেছিলো। স্বাধীনতার উন্মাদনায় হয়েছিলো অন্ধ।

পক্ষান্তরে বিভিন্ন স্থানে সংগ্রাম শেষে ইংরেজরা যখন ক্ষমতা ফিরে পেয়েছিলো তখন তারাও বিচারের ধার ধারেনি। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে, অনুমান কিংবা অভিযোগের ভিত্তিতে তারা হত্যা করেছিলো হাজার হাজার নিরপরাধকে। ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালিয়েছিলো নির্দয়ভাবে। ভবিষ্যতে যাতে স্বাধীনতার নামে ভারতবাসী আর মাথা উঁচু করতে সাহস না পায় সেই উদ্দেশ্যেই করেছিলো তারা অত্যাচার। যুব সম্প্রদায়, সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ, স্বাধীনচেতা শিক্ষিত মানুষ ছিলো তাদের প্রথম শিকার। চতুর্দিক থেকে নিরাপদ হওয়ার কারণেই ঠাণ্ডা মাথায় চলিয়েছিলো তারা হত্যাযজ্ঞ। আর গরম মাথায় পরিকল্পনাহীন ভাবে মেরেছিলো সকলকে। সামনে পেলেই হলো। খেয়াল চাপলে কথা নেই। তা কার্যকর করতেই হবে। এই ব্যবস্থা চলেছিলো বিজয় শেষে সর্বত্র। শুধু একা জেনারেল নীলকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সেদিন প্রায় সকলের আচরণ ছিল নীলের অনুরূপ। সব ইংরেজ কর্মকর্তাই অমানুষ হয়েছিলেন ভারতীয়দের দমনের নামে, নিষ্কন্টক হওয়ার অভিপ্রায়ে। সেদিন তারা বিশেষভাবে হত্যা করেছিলেন মুসলিম দেশপ্রেমিক ও জমিদার মহাজনদের। কারণ, তাদের নিয়েই ছিলো ইংরেজদের ভয়। রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলো তারা মুসলিমদের নিকট থেকে। পুনঃপ্রাপ্তির আশায় বাহাদুর শাহের মতো অন্য কারো নেতৃত্বে হয়তো আবার কখনো বিদ্রোহ করে বসবে। শত্রুর শেষ রাখা ঠিক নয়।

জেনারেল নীলের নির্মমতাকে অনেকে নানাসাহেবের নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ বলে সন্ত্বনা পেতে চেয়েছিলো। কিন্তু 'হোম' নামক জনৈক ইংরেজ কর্মকর্তা বলেছেন, 'শিশু-বৃদ্ধ-নারী কেউ আমাদের প্রতিহিংসার কবল থেকে রেহাই পায়নি। জেনারেল নীলের আদেশেই হয়েছে সবকিছু। নিহত ইংরেজ আত্মীয়-স্বজনদের সান্তনা দেয়ার জন্যে যে জেনারেল নীল গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে ছারখার করেছেন, হাজার হাজার নিরপরাধ নিঃসহায় মানুষকে হত্যা করেছেন, এমন মনে করা ঠিক হবে না। কারণ এলাহাবাদে আরও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিলেন তিনি আরো আগে। সতীচওরা ঘাটের দুর্ঘটনার পূর্বে। তাই জেনারেল নীলকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন উম্মাদ বলা চলে। নানাসাহেবকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে যেমন অপরাধী করা যায়, জেনারেল নীলকে করা যায় মানবতার দিক থেকে।

তিন

কানপুর শহর পুনর্দখলের পর জেনারেল নীল সেখানে যাকে পেলেন তাকেই চাপকালেন। তরবারির ধার পরীক্ষা করলেন অনেকের গর্দানে। তাজা-পোক্ত যুবকদের ঝুলালেন গাছের ডালে, ফাঁসির দড়িতে। তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন বিদ্রোহী সিপাহীদের। একজনকেও পাওয়া গেলো না কোথাও। ক্ষোভে, দুঃখে, ব্যর্থতায় তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। বিবিঘরে কিংবা সতীচওয়াঘাটে যারা নৃশংসতা দেখিয়েছিলো তাদের আদর্শ শাস্তি দিতে না পারার বেদনায় তিনি হলেন মর্মাহত। শত শত নিরপরাধ লোককে মেরেও তিনি শান্তি পেলেন না। প্রবোধ পেলেন না অন্তরে।

অবশেষে হুলিয়া জারি করলেন,—'সতীচওরাঘাটে কিংবা বিবিঘরে যারা ইংরেজদের হত্যা করেছিলো তাদের কাউকে ধরে দিতে পারলে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।'

কেউ সাড়া দিলো না। পাবে কোথায় তাদের ? সবাই তো চলে গেছে নানা সাহেবের সাথে অযোধ্যার দিকে। পরাজয় নিশ্চিত জেনে কেউ কি থাকে অকুস্থলে ? শত্রুর হাতে ধরা দিতে চায় সহজে ? তবু একজন ধরা পড়লো। একজন মারাঠা টাকার লোভে সফর আলী নামে এক প্রবাসীকে ধরে আনলো জেনারেল নীলের কাছে। সফর আলীর বাড়ি কানপুরে নয়, রোটকে। মারাঠা নীল সাহেবকে বললো, সৈন্য বাহিনীতে কাজ করতো সফর আলী। সেকেণ্ড রেজিমেন্টের লাইট ইনফ্যানট্রির দফাদার ছিলো সে।

—তাতে কি হয়েছে ? অপরাধ কি তার ? বাজখাই কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জেনারেল নীল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মারাঠা বললো,—এই লোকটাই সতীচওরাঘাটে জেনারেল হুইলারকে হত্যা করেছিলো।

—সত্যি ?

—জ্বি হুজুর।

সফর আলী কাঁদতে কাঁদতে অনুনয়ের সাথে বললো,—না হুজুর, মিথ্যে কথা। আমি তখন কানপুরে ছিলাম না। জেনারেল হুইলার কোথায় মরেছেন, কে তাঁকে মেরেছে আমি কিছুই জানি না।

—জানিস না, তা হলে এতে লোক থাকতে তোর কথা বলছে কেন ? নিশ্চয়ই তুই জেনারেল হুইলারকে মেরেছিস।

—আমাকে বিশ্বাস করুন হুজুর। সব মিথ্যে কথা। বানানো কথা। আমি বিদেশী। টাকার লোভে আমাকে ধরে এনেছে।

—তাই যদি হবে, অন্য লোককে আনলো না কেন ? দেশে তো লোকের অভাব নেই।

—পরিচিত লোকদের আনতে হয়তো সাহস পায়নি। আমার আত্মীয়-স্বজন এখানে কেউ নেই। তাই সাহস পেয়েছে। আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না হুজুর। আমি নির্দোষ, নিরপরাধ। ওই মিথ্যেবাদী লোভীটা মিথ্যে কথা বলছে হুজুর।

অনেক কাকুতি মিনতি করলো সফর আলী। যুক্তিও দেখালো বিস্তর। কিন্তু কাজ হলো না কিছু। জেনারেল নীল বেশি বিচার-বিবেচনা করতে গেলেন না। তার বিশ্বাস, ধরা পড়লে, প্রাণে বাঁচার জন্যে সব বেটাই মিথ্যে বলে, নিজের সাফাই গায়। এসব ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া কঠিন। সাক্ষীর কথাই বিশ্বাস করা উচিত।

জেনারেল নীলের চিন্তা করা উচিত ছিলো, সফর আলী যদি জেনারেল হুইলারের হত্যাকারীই হবে, তবে সবাই যখন পালিয়েছে তখন সে এখানে থাকবে কেন ? সেও তো পালিয়ে যাবে স্বদেশে। নিজের আত্মীয়-স্বজনের কাছে। কিংবা নিরাপদ আশ্রয়ে। তাছাড়া ওই মারাঠা কেমন করে সতীচওরাঘাটের খবর রাখলো ? নিজ চোখে যদি সে দেখে থাকে, তবে সেও তো ছিলো তখন সেখানে। হত্যাকাণ্ডের মধ্যে তাহলে সেও তো ছিলো জড়িত। পুরস্কারের পরিবর্তে তাকেও শাস্তি দেয়া উচিত।

জেনারেল নীল সেসব চিন্তা করলেন না। অন্ধভাবে বিশ্বাস করলেন মারাঠাকে। এনাম দিলেন তাকে। আর বেচারা সফর আলীকে দিলেন ফাঁসির হুকুম। তৈরি হলো ফাঁসির মঞ্চ। হাজার কাকুতি মিনতি করেও রেহাই পেলোনা সফর আলী।

ফাঁসির দড়িতে ঝোলানোর আগে জেনারেল নীল নিজেই তাকে নিয়ে গেলেন বিবিঘরে। নতুন ফন্দি এলো তার মাথায়। মেজর বুরুশকেও নিলেন সাথে। বিবিঘরের লাশ তখন সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু মেঝের উপর পড়েছিলো চাপ চাপ জমাট বাঁধা রক্ত। জেনারেল নীলের উদ্দেশ্য তখন কেউ বুঝতে পারেনি। মজা দেখার জন্যে সাথে গেলো তাই অনেকে।

বিবিঘরে ঢুকে জেনারেল নীল বাজখাই গলায় সফর আলীকে আদেশ দিলেন,—নামাজ পড়ার মতো হাঁটুর উপর বোস্, কুকুরের মতো জিফ দিয়ে চেটে নে রক্ত।

জেনারেলের আদেশ শুনে চমকে উঠলো বেচারা সফর আলী। কিছুক্ষণ আগে ফাঁসিতে ঝোলার কথায় সে এতো ভয় পায়নি। এবার যেন সে কুঁকড়ে গেলো। করুণ দৃষ্টিতে তাকালো জেনারেল নীলের মুখের দিকে। করুণা ভিক্ষা চাইলো। মিনতি করে বললো,—হুজুর, বিশ্বাস করুন আমি নিষ্পাপ নিরপরাধ। আমি কোনো অন্যায় করিনি। ঘরে আমার ছেলে আছে। আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম এই পথে। জোর করে লোকটা আমাকে ধরে এনেছে। আমাকে মাফ করুন হুজুর।

—মাফ তোকে করছি। ফাঁসির দড়ি দেখলি না চোখে ? একটু পরে ওখানে ঝুলতে হবে তোকে।

—তা ঝোলান হুজুর, মেরে ফেলুন আমাকে। কিন্তু মা মানুষের রক্ত চাটতে বলবেন না। আমি পারবো না।

—তুমি পারবে না তোমার জিভ পারবে।

মুখের কথা শেষ হতেই সপাং করে চাবুক পড়লো সফর আলীর পিঠে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেলো সে। মুখ উঁচু করার চেষ্টা করলো বেচারা। পারলো না। চাবুকের আরেকটা ঘা পড়লো তার পিঠে। পর পর অনেকগুলো। জেনারেল নীলের আদেশে মেজর বুরুশ বেদম চাবুক চালালেন সফর আলীর পিঠে। চামড়া ফেটে তাজা রক্ত ছুটতে লাগলো ফিন্‌কি দিয়ে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগলো সফর আলী। কিন্তু করুণা হলো না জেনারেল নীলের। চাবুকের আঘাত সহ্য করতে না পেরে উপুড় হয়ে বসলো সফর আলী। মুখ নিচু করে জিভ দিয়ে চাটতে লাগলো শুকনো জমাট বাঁধা রক্ত। সে দৃশ্য দেখে উপস্থিত ইংরেজ সিপাহীরা পৈশাচিক হাসিতে ফেটে পড়লো।

সফর আলী আর কাঁদলো না। বাঁচার জন্যে যুক্তি দেখালো না। শুধু বললো,—খোদা, এই অন্যায়ের বিচার না করে আমার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করলো, তার বিচার খোদা তুমি নিজেই করো। এদেশে রাজত্ব কায়েম করার জন্যে এরা আমাদের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার করছে, বিনা কারণে উৎপীড়ন চালাচ্ছে, সৈনিক কিংবা শক্ত-সমর্থ মানুষ পেলেই ফাঁসি দিচ্ছে। এসবের প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি ও সাহস খোদা তুমি ভারতবাসীদের দিও।

বিবিঘরে জিভ দিয়ে রক্ত চাটার পর সফর আলীকে নিয়ে আসা হলো ফাঁসির মঞ্চে। অনেক বেদনাহত অথর্ব মারাঠা সেখানে এসেছিলো সফর আলীকে এক নজর দেখার জন্যে। তারা দেখলো, সকাল বেলা যে সফর আলী বাঁচার জন্যে মিনতি করছিলো, নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যে যুক্তি দেখাচ্ছিল, প্রাণ ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলো, সে এখন নির্ভীক। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে ফাঁসির মঞ্চের দিকে।

দুর্বল মানুষও মৃত্যুকে যখন নিশ্চিত জানে তখন হয়তো বীর পুরুষের মতো নির্ভীক হতে পারে। মৃত্যুভয়কে জয় করার কারণেই আর কাঁদেনা। চোখের পানি তার শুকিয়ে যায়। সফর আলীরও তেমনি গেলো।

ফাঁসির দড়ি স্বেচ্ছায় গলায় পরার আগে সফর আলী রক্তবর্ণ চক্ষু দু'টো তুলে ধরলো উপস্থিত অসহায় দেশবাসীর করুণ মুখের দিকে। অকম্পিত কণ্ঠে বললো,—ভাইসব, দেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম। নেতাদের ভুলের জন্যে পারলাম না। অন্যায়ভাবে আমাকে মারা হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনও জানতে পারলো না আমার জীবনের করুণ পরিণতি। আমার একটা নাবালক ছেলে আছে। পারলে আমার খবরটা তাকে কেউ পৌঁছে দিও। আর বলো, সে যেনো তার বাপের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আমি কোনো ইংরেজকে মারিনি। মিথ্যে দোষ চাপানো হয়েছে আমার ঘাড়ে। কিন্তু সে যেন অন্ততঃ একজন ইংরেজকে মেরে এই অন্যায়ের প্রতিকার করে। আমার মরণের বদলা নেয়। তা হলেই আমার আত্ম শান্তি পাবে।

জেনারেল নীল সফর আলীর আবেগময় বক্তৃতা শুনে কিছু বললেন না। মুচকি হাসলেন। মারাঠারা ইশারায় তাকে কথা দিলো। ছেলের কাছে পিতার শেষ বাসনা পৌঁছে দেয়ার ওয়াদা করলো। আশ্বস্ত হলো সফর আলী! ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলো সে

ফাঁসি মঞ্চের দিকে। স্বেচ্ছায় গলায় পরিয়ে নিলো ফাঁসির দড়ি। দু'মিনিটেই সব শেষ হয়ে গেলো। অতঃপর সফর আলীর প্রাণহীন দেহটা ফেলে দেয়া হলো খরস্রোতা নদীতে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে শেষ হলো সফর আলীর ব্যর্থ জীবনের করুণ পরিণতি। কিন্তু মৃত্যুর আগে অন্যায়ভাবে তাকে দিয়ে কুকুরের মতো মানুষের রক্ত চাটিয়ে নেয়ার কথা স্থানীয় লোকেরা ভুলতে পারলো না। পৌঁছে দিলো সে মর্মান্তিক সংবাদ তার ছেলের কাছে। তাকে জানিয়ে দিলো তার পিতার অন্তিম বাসনা।

পিতার মৃত্যু সংবাদে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো সফর আলীর ছেলে মজর আলী। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করেছিলো সাথে সাথে। কিন্তু জানতে দেয়নি কাউকে। মনের কথা গোপন রেখেছিলো কাজ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত।

জেনারেল নীল যে শুধু সফর আলীকে বিবিঘরে রক্ত চাটিয়ে ফাঁসি দিয়েছিলেন, তাই নয়, আরো অনেককে ওই একই পন্থায় হত্যা করেছিলেন। অবমাননা করেছিলেন মানবতার। সিভিল কোর্টের একজন মুসলমান অফিসারের বিরুদ্ধে আরেকজন দুষ্ট মারাঠা মিথ্যে অভিযোগ তোলে। টাকার লোভে কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতা বশে করা হয়েছিলো সে মিথ্যে অভিযোগ। জেনারেল নীল বুঝতে পারা সত্ত্বেও সাক্ষীকে কিছু না বলে অভিযুক্ত সম্ভ্রান্ত মুসলমান অফিসারটির উপর করেছিলেন একই ধরনের অত্যাচার। আসলে প্রতিশোধ গ্রহণের পশুসুলভ মনোবৃত্তি তখন তাঁকে পেয়ে বসেছিলো। বিচার বিশ্লেষণের মানসিকতা তাঁর লোপ পেয়েছিলো। তিনি তখন ভাবতেন, শাস্তি দেয়ার মতো কাউকে পেলেই হলো। সত্য-মিথ্যা যাচাই করে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। এ সম্বন্ধে এক চিঠিতে তিনি নিজেই লিখেছেন,—'দেশীয় ব্যক্তিদের চিরদিন মনে রাখার মতো আদর্শ শাস্তির ব্যবস্থা আমি করেছি। সে আদেশ যথাযথ প্রতিপালনের জন্যে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আমি কড়া নির্দেশ দিয়েছি। আমার আদেশের কঠোরতা হয়তো অনেকের পছন্দ হবে না। শান্ত-স্বভাব হৃদয়বান ব্যক্তিরা হয়তো প্রতিবাদ করবেন। দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধেরা আঁতকে উঠবেন। আমাকে দোষারোপ করবেন। তবু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বর্তমান সঙ্কটময় মুহূর্তে এটাই একমাত্র কর্তব্য। দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাবার সময় এটা নয়। চরম দণ্ডই এখন ভারতবাসীর প্রাপ্য। তাই আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যই আমার এই কড়া নির্দেশ।'

'যারা বিদ্রোহে যোগদান করেছিলো, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সাহায্য করেছিলো তাঁদের উপরই প্রযোজ্য আমার নির্ধারিত শাস্তি। অন্যায়কারীদের মধ্যে যাকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়েছে শুধু তারাই শাস্তি পেয়েছে—পাচ্ছে। আমার বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ডই তাদের একমাত্র এবং শেষ দণ্ড। ধৃত ব্যক্তির মৃত্যুর আগে আরেকটা শাস্তির আদেশ আমি দিয়েছি। সেটাতে অনেকের আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু সেটাই মনে রাখার মতো কাজ। ভবিষ্যতে তা হলে আর কোনো পাষণ্ড এমন নিষ্ঠুর খেলায় কখনো মেতে উঠতে সাহস পাবে না।'

'শাস্তিটা হলো, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর আগে নিয়ে যাওয়া হবে নিষ্ঠুরতার সাক্ষী বিবিঘরে। তাকে বাধ্য করা হবে সেখানকার মেঝের রক্ত জিভ দিয়ে

চেটে তুলতে। নিরপরাধ ইংরেজ নর-নারীর রক্তে রঞ্জিত বিবিঘরের মেঝে এভাবেই করাতে হবে পরিষ্কার। কাজটা যে ঘৃণার, অমানবিক ও ন্যাক্কারজনক সেটা বোঝানেই আমার উদ্দেশ্য। যতক্ষণ এই অনভিপ্রেত শাস্তি আসামী মেনে না নেবে, ততক্ষণ তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে না। চাবুক মেরে বাধ্য করা হবে বিবিঘরের শুকনো রক্ত জিভ দিয়ে চাটতে। দরকারবোধে চাবুকের আঘাতে তাকেও করা হবে রক্ত-রঞ্জিত, ক্ষত-বিক্ষত। শুধু ফাঁসিই বর্তমানের জন্য আদর্শ শাস্তি নয়।'

'সিভিল কোর্টের এই অফিসারটি বিবিঘরের নৃশংতার সাথে জড়িত ছিলো কি না—আমি জানি না, তবে তার স্বাস্থ্য ও চেহারা দেখে মনে হয়, সেও বদমায়েশদের সাথে ছিলো। বেশ সাহসী লোকটা। সে কিছুতেই নিজের দোষ স্বীকার করেনি। নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যে নানা রকম যুক্তিতর্ক দেখিয়েছিলো। তবু কেন জানি, সেই শিক্ষিত লোকটাকে গুণ্ডাপাণ্ডা বলেই আমার বিশ্বাস হয়েছিলো। মানে করেছিলাম, সে আসলে পাজী। বাঁচার জন্যে মিথ্যে বলছে। প্রমাণ পাওয়া যাক আর না যাক, তাকেই আমার নির্ধারিত শাস্তি দিতে হবে।'

'নিয়ে যাওয়া হলো তাকে বিবিঘরে। নীল ডাউন হয়ে বসতে বাধ্য করা হলো। তারপর আদেশ দেয়া হলো, মুখ নীচু করে জিভ দিয়ে মেঝের রক্ত চাটতে। লোকটা শিক্ষিত অফিসার, সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তাই অন্যদের মতো মানতে চাইলো না আমার নির্দেশ। কিছুতেই মাথা নীচু করলো না। বললো,—আমাকে—ফাঁসি দিতে চাও, দাও এই কাজ আমি করবো না। কোনো মানুষ করতে পারে না। কিন্তু সে জানতো না, এর আগে ফাঁসিতে ঝোলার পূর্বে সবাই এই কাজটি করে গেছে। পালন করেছে আমার আদেশ। মান্য করেছে আমার নতুন ধরনের উদ্ভট আইন। অবশ্য প্রথম ধাক্কায় ভালো মানুষের মতো কেউ পালন করেনি। চাবুকের প্রচণ্ড আঘাতই তাদের সুবোধ বানিয়েছিলো। আইনানুগ করেছিলো।'

'এই অফিসারটির ব্যাপারেও আমাকে মোক্ষম ওষুধটা প্রয়োগ করতে হলো। এতদিন সে ইংরেজ অফিসারদের সাথে কাজ করে তাদের ভদ্র রূপটাই দেখেছিল। তাই অবদার ধরেছিলো। আপত্তি জানিয়েছিলো রক্ত চেটে তুলতে। ইংরেজদের দ্বিতীয় রূপটি এবার তাকে দেখানো হলো। সপাং সপাং করে যখন তার নধর দেহে নিষ্ঠুর চাবুকের প্রচণ্ড আঘাত পড়তে লাগলো তখন সে রক্ত চাটায় দিশে পেলো না। চাবুকের বাহাদুরী প্রত্যক্ষ করলাম স্বচক্ষে।'

'এই উদ্ভট শাস্তির জন্য অনেকেই হয়তো আমাকে দোষারোপ করবেন। ভাববেন, এতো বাড়াবাড়ি না করলেও চলতো। কেউ কেউ বলবেন, যাকে ফাঁসি দেয়া হলো তার উপর আবার এমন জঘন্য অত্যাচার কেন ? যদি অন্য শাস্তি দেয়াই হলো, তবে ফাঁসি কেন ? কথাটা যে আমি বুঝিনা, তা নয়। বিশ্বাস করুন, দুষ্টুদের জন্যে, বিদ্রোহীদের জন্যে, ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্যে, এটাই সব চাইতে উপযুক্ত শাস্তি। শুধু ফাঁসি দিয়ে কিংবা কামানেব মুখে হত্যা করে ওদের অপরাধের সত্যিকার শাস্তি হয় না। অপরাধ অনুযায়ী সাজা হওয়া উচিত। আমি তাই করেছি। সূক্ষ্ম বিচার-সালিসের মাধ্যমে অপরাধী

বাছাই করতে গেলে একজনকেও শাস্তি দেওয়ার যেতো না। কেউ স্বেচ্ছায় নিজের দোষ স্বীকার করতো না। সাক্ষীরাও সঠিক প্রমাণ খাড়া করতে পারতো না। ফলে সবাই খালাস পেতো। আমার আইনের হতো অপমৃত্যু। আবার একদিন ওরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। ঝাঁপিয়ে পড়তো ইংরেজ নিধনে। করতে চাইতো বিদ্রোহ। স্বাধীনতার নামে ঘটতো অঘটন। আমি সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি।'

জেনারেল নীল জানতেন না যে, শক্তি প্রয়োগে স্বাধীনতাকামীদের দমিয়ে রাখা যায় না। অন্যায় অত্যাচারের মাধ্যমে শান্ত করা যায় না নিরীহ ব্যক্তিদেরও। বরং হত্যা রাহাজানীর নামে প্রথমে যারা আঁতকে উঠে, উৎপীড়ন আর নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তারাই যায় বিগড়ে। হাতে তুলে নেয় অস্ত্র। উদ্বুদ্ধ হয় প্রতিশোধ গ্রহণে। শুধু ভারতবর্ষের নয়, আফ্রো-এশীয় প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে এমন ধরনের নিষ্ঠুরতা ও দেশপ্রেমিকদের ত্যাগের নিদর্শন রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীরা স্বেচ্ছায় ভদ্রলোকের মতো কোনোদিন কোনো দেশের স্বাধীনতা প্রদান করেনি। প্রতিরোধের মুখে টিকতে না পেরে একান্ত বাধ্য হয়ে লেজ গুটিয়েছে। দিয়েছে স্বাধীনতা। চেষ্টা করেছে ব্যবসায়িক কারণে সম্পর্ক বজায় রাখতে। ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে অতীতের অমানবিক কার্যকলাপ। গ্রহণ করেছে বন্ধু হিসেবে। কিন্তু তার আগে মার খেতে হয়েছে বিস্তর। অত্যাচারীতেরা যখন প্রতিশোধ গ্রহণে পুরোপুরি সক্ষম হয়েছে, বিদেশী প্রভুদের মোহভঙ্গ হয়েছে শুধু তখনই। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর নব্বই বছর এই উপমহাদেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। বার বার আঘাত হানতে হয়েছে। দেশপ্রেমিকরা সন্ত্রাসবাদ ছাড়াও অন্যান্য পন্থায় ব্যতিব্যস্ত রেখেছে ইংরেজদের। উপযুক্ত আঘাত হেনেছে জেনারেল নীলের অধস্তনদের উপর। তার পরই তো ভদ্রলোকের মতো সাগর পাড়ি দিয়ে ফিরে গেছে তারা স্বদেশে।

সফর আলীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ত্রিশ বছর পরে উত্তর ভারতে ঘটেছিলো আরেকটা অনভিপ্রেত মৃত্যু। মেজর এ. এইচ. এস নীল নামক একজন তরুণ ইংরেজ অফিসারকে আকস্মিকভাবে হত্যা করে তারই একজন প্রিয় অশ্বারোহী। সেকেন্ড রেজিমেন্টের সুদক্ষ সওয়ার ছিলো সে। তার নাম মজর আলী।

তখন কোম্পানী রাজত্বের অবসান হয়েছে। ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ভারতবাসীদের উপর যে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচার করা হয়েছিলো, তৎকালীন ইংরেজ সরকার তা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেয়েছেন। তাদের তখন বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হাতে বিশাল ভারতের শাসনভার ভেড়ে দেয়া যায় না। ভারতবাসী সহজ মনে আর তাদের গ্রহণ করবে না। ফলে অসন্তোষ আর অশান্তি লেগেই থাকবে। কারণ, কোম্পানির কর্মচারীরা স্বেচ্ছাচারী। আইনের চাইতে বে-আইনই করে বেশি। তাই ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনের জন্যে একটা কাউন্সিল গঠন করেন। পনরজন সদস্য ও একজন সেক্রেটারী নিয়ে গঠিত হয় সে কাউন্সিল। ভারতবর্ষ শাসনের ব্যাপারে তারাই নীতি নির্ধারণের অধিকার পান। মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের গভর্ণর

জেনারেলকে তাঁর নিজস্ব ভাইসরয় বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এভাবে আইনের কঠিন নিগড়ে আনার চেষ্টা করা হয় অশান্ত ভারতবর্ষকে।

লর্ড ডালহৌসীর কুখ্যাত স্বত্বলোপ নীতি এ সময় বর্জন করা হয়। সার্বভৌম ব্রিটিশ সরকার এক স্পষ্ট ঘোষণায় উল্লেখ করে, 'ভারতবর্ষে আর রাজ্য বিস্তার করা হবে না।'

দেশীয় রাজন্যবর্গের মনের সন্দেহ দূর করার এটা ছিলো একটা প্রচেষ্টা। যে সব কারণে ভারতবর্ষে ১৮৫৭ সালে ব্যাপক আকারে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিলো, সে সব কারণ দূর করার চেষ্টা এভাবে ব্রিটিশ সরকার করেছিলো। অশান্ত ভারতবাসীকে শান্ত করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য।

কোম্পানি আমলে শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের মধ্য থেকে উচ্চপদে কর্মচারী নিয়োগ করা হতো না। বিশ্বাস করা হতো না দেশবাসীকে। স্বাভাবিকভাবে দেশবাসীর সাথে তাই ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র গড়ে উঠতো না। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ এবং নির্মমতার মূলে ছিলো মায়া-মমতার অভাব। যোগাযোগ না থাকলে পরস্পরের মধ্যে মায়া-মমতা গড়ে উঠতে পারে না। সে কারণে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনযন্ত্রে অনেক বেশি পরিমাণে ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা করে। এভাবে কমানোর চেষ্টা করা হয় শাসক আর শাসিতের মধ্যেকার দূরত্ব। নৈকট্যের মাধ্যমে সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা চলে।

আগের তুলনায় বেশি পরিমাণে আমদানী করা হয় ব্রিটিশ সৈন্য। বিদ্রোহের আগে দেশীয় সিপাহীদের সংখ্যাই ছিলো বেশি। ব্রিটিশ সেনা ছিলো নগণ্য। বিপুল সংখ্যক ইংরেজ সৈন্য দেশ থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ভারতে। ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে আর বিশ্বাস করতে চায় না।

এই সময়ের সবচেয়ে বড় কাজ হলো ভারতবর্ষের দু'টি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির সুকৌশল অপচেষ্টা। সুদীর্ঘ সাতশত বছর মুসলমান সুলতান বাদশাহদের শাসন আমলে ভারতবর্ষের কোথাও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা কিংবা মনোমালিন্য ছিলো না। হিন্দু-মুসলমান মিলে মিশেই চলতো, পরস্পরের সুখে-দুঃখে এগিয়ে আসতো, একজন আরেকজনকে পর ভাবতে পারতো না। সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা নিজেদের শাসক ভাবতো না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাও নিজেদের শাসিত মনে করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ পেতো না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হওয়ার তাই কোনো হেতু ছিলো না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে সে কারণেই হিন্দু মসুলমান সিপাহীরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলো ইংরেজদের বিরুদ্ধে। মরেও ছিলো একত্রে। নিজেদের বিরুদ্ধে কেউ অস্ত্র ধারণ করেনি। এই ঘটনা থেকে ইংরেজেরা একটা বড় শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা ভাবে, এভাবে হিন্দু-মুসলমান যদি ভবিষ্যতে একযোগে কাজ করার সুযোগ পায় তবে আবার যে-কোনো সময় মারাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হতে হলে এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মিলনে চিড় ধরাতে হবে। এক সম্প্রদায়কে কাজে লাগাতে হবে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। সে ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দুদের হাত করতে হবে আগে। কারণ তারা

ভারতবর্ষের আদি অধিবাসি হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন শাসিত। বাড়তি সুযোগ-সুবিধে দিয়ে তাদের স্বমতে আনা অপেক্ষাকৃত সহজ। মুসলমানদেরও অবহেলা করলে চলবে না। তাদেরও কাজে লাগাতে হবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে। সৃষ্টি করতে হবে দুটি মন, দুটি জাতি।

সে ব্যাপারেও তারা কৃতকার্য হয়েছিলো। পিছিয়ে দিতে পেরেছিলো স্বাধীনতা সংগ্রাম। একজোগে আর আগের মতো হিন্দু-মুসলমান নেতা-উপনেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামে উপনীত হতে পারেনি। ফলে নব্বই বছর পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুটি দেশে বিভক্ত হয়েছিলো।

বলছিলাম অশ্বারোহী বাহিনীর সৈনিক মজর আলীর কথা। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদনা মানুষ তখন ভুলতে বসেছে। স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সামাজিক আর রাজনৈতিক জীবন। কোম্পানি রাজত্বের অবসানের সাথে সাথে কমে এসেছে অত্যাচারের মাত্রা। মানুষ আর খুন করে না ইংরেজদের। ইংরেজরাও দেশীয় মানুষদের হত্যা করে না। কথায় কথায় প্রদর্শন করে না নৃশংসতার চরম পরাকাষ্ঠা। ঠিক এমনি সময়ে ১৮৮৭ সালে মজর আলী ঘটালো এক অঘটন।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও মার্চের মেঘমুক্ত আকাশে রক্তিম সূর্য উঁকি দিচ্ছে। হিমেল হাওয়া শীতল পরশ বুলাচ্ছে প্রকৃতির বুকে। অশ্বারোহী বাহিনীর জোয়ানেরা সামরিক কায়দায় প্যারেড গ্রাউন্ডে সমবেত হয়েছে। মেজর নীলের আদেশে আরম্ভ হলো রুটিন মাফিক প্যারেড। শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিক দল। কুচকাওয়াজের পর আরম্ভ হলো বন্দুকের কসরৎ। হঠাৎ একটা গুলী গিয়ে আঘাত করলো মেজর নীলের উন্নত বক্ষে। ঘোড়া থেকে দেহটা গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। মুহূর্তে ঘটে গেলে দুর্ঘটনা। চমকে উঠলো সবাই। ধরে ফেললো গুলী নিক্ষেপকারী মজর আলীকে। বন্দী করে নিয়ে গেলো তাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।

বিচার সভা বসলো। অনেকে ব্যাপারটাকে দুর্ঘটনা বলে মনে করলো। কিন্তু স্পষ্ট স্বীকার উক্তি করলো মজর আলী। সে বিচারকদের জানালো,—'ঠিক ত্রিশ বছর আগে বিনা কারণে আমার পিতা সফর আলীকে জেনারেল নীল অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলেন। তিনি বিচারের ধার ধারেননি। একজন মিথ্যাবাদীর সাক্ষে ফাঁসি দিয়েছিলেন আমার জন্মদাতাকে। ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে বিবিঘরের শুকনো রক্ত জিভ দিতে পরিষ্কার করতে বাধ্য করানো হয়েছিলো তাকে। মানব ইতিহাসে এমন জঘন্য নজির দ্বিতীয়টি আছে কিনা আমি জানিনা। মৃত্যুর আগে সে অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তিনি আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। তখন আমি ছোট ছিলাম। ত্রিশটি বছর তাই আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। গ্রহণ করতে হয়েছে সামরিক বিভাগে চাকরি। কাজে লাগাতে হয়েছে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ।

জেনারেল নীলকে আমি পাইনি, পেয়েছিলাম তার ছেলে মেজর নীলকে। তার মধুর ব্যবহার আমাকে দ্বিধান্বিত করেছিলো। ভেবেছিলাম, নিষ্ঠুর পিতার অমার্জনীয় অপরাধে শান্ত মেজাজের হৃদয়বান পুত্রকে হত্যা করবো না। কিন্তু আমি মানসিক শান্তি পাচ্ছিলাম না। মনে হতো, আমার নিরপরাধ পিতার আত্মা অশান্তি ভোগ করছে। আমাকে মনে করছে অপদার্থ। তাই আমি নিজ হাতে গুলী করে মেজর নীলকে হত্যা করেছি।

আপনারা আমাকে অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম মনে করতে পারেন। অন্তরদ্বন্দে আমিও দীর্ঘদিন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। পিতার অপরাধে পুত্রকে হত্যা করা অনুচিত মনে করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনের তাগিদের কাছে আমি বড় করুণভাবে পরাস্ত হয়েছি। আমার নিরাপরাধ পিতার সানুনয় অনুরোধ জেনারেল নীলের হৃদয় গলাতে পারেনি। নির্মম হত্যার নৃশংসতা তাকে সেদিন পেয়ে বসেছিলো। বিনা বিচারে অন্যান্য হাজার হাজার দেশ প্রেমিক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর মতো তাকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। অন্যান্য শহীদের ছেলের মতো আমিও হয়তো ভুলে যেতে পারতাম পিতৃশোক। পিতার অনভিপ্রেত মৃত্যুকে মেনে নিতে পারতাম বিধান হিসাবে। কিন্তু বিবিঘরের শুকনো রক্ত জিভ দিয়ে চাটানোর মতো অমানবিতাকে আমার মন কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। পারেনি রক্ত চাটার আগে তার উপর জেনারেল নীলের চাবুকের হিংস্র আঘাতকে। তাই আমার রক্ত গরম হয়ে উঠেছিলো। বিবেক আমাকে তাড়িত করতো প্রতিহিংসার প্রতিশোধ গ্রহণে। মন বলতো জেনারেল নীলকে পাওয়া না গেলেও তার ছেলেকে তো পেয়েছ। তাকেই হত্যা করো না কেন ? কেউটের বাচ্চা যতো শান্তই হোক না কেন, তার দেহেও বইছে সেই একই বিষ। সুযোগ পেলে সেও তোমাকে ছোবল মারবে। অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়ে যদি কিছুটা অন্যায় হয়, হোক না। তুমি চাকরির খাতিরে সুখে থাকলে তোমার পিতার আত্মা শান্তি পাবে না। পুত্র হিসেবে তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করছো না।

রাত্রে আমার ঘুম হতো না। তাই আমি নিজ হাতে মেজর নীলকে হত্যা করে পিতা হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি। মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। এই দিনটার জন্যেই আমি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেছিলাম। বিয়ে-শাদী করে সংসারী হইনি। আমার জন্যে কেউ কাঁদবে না। বরং আমার পিতা খুশী হবেন। কিছুক্ষণ পরেই আমরা অনন্ত আকাশে মিলিত হবো। উভয়ে স্বস্তি পাবো।

বিচারে মজর আলীর ফাঁসি হয়েছিলো। কোনো সাক্ষী প্রমাণের দরকার হয়নি। ১৮৮৭ সালের ১৪ই মার্চ তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। হাসিমুখে দৃঢ় পদক্ষেপে মজর আলী এগিয়ে যায় ফাঁসির মঞ্চে।

চার

বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়ও তৎকালীন ইংরেজ সরকারের সেনানিবাস ছিলো। ঐতিহ্যবাহী লালবাগ দুর্গে ছিলো প্রধান ঘাঁটি। কিন্তু তাদের হেড কোয়ার্টার ছিলো জলপাইগুড়িতে। সেখানকার আদেশ-নিষেধেই চালিত হতো লালবাগ দুর্গের সিপাহীরা।

সারা ভারতে যখন সিপাহী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, সর্বভারতের রাজধানী দিল্লী যখন ইংরেজমুক্ত হয়, তখনো জলাপাইগুড়ির নির্দেশের অভাবে ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেতে পারেনি। ইতিমধ্যে অবশ্য কয়েকবার বিদ্রোহের খবর ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়েছিলো। স্বল্প সংখ্যক ইংরেজ সেনাপতি ও বেসামরিক কর্মকর্তা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লালবাগ দুর্গে বিদ্রোহ দেখা দেয়নি।

গুজবের ভিত্তিতে ঢাকাবাসী ইংরেজরা ৩০শে জুলাই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুরাতন ঢাকায় অবস্থিত তৎকালীন ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হন। পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার বাহিনী নামে দুটো স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তারা সেদিন গঠন করেন। সে সময় মাত্র ষাটজন ইউরোপীয়ের অধিকারে ছিলো আগ্নেয়াস্ত্র। ইংরেজ অস্ত্রধারীদের দু'ভাগে ভাগ করা হয়। পদাতিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা হয় মেজর স্মীথকে। লেফটেন্যান্ট হিচিন্‌স-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় ঘোড়সওয়ার বাহিনীর। কিন্তু রাত্রে পাহারা দেওয়া ছাড়া বেশি কিছু করতে হয় না তাদের। ঢাকার বাঙ্গালী সিপাহীরা বিদ্রোহ করে না। তারা সুযোগ ও নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে। জলপাইগুড়ি থেকে কোনো নির্দেশ আসে না। লালবাগ দুর্গও থাকে শান্ত।

জলপাইগুড়ি থেকে নির্দেশ না আসার কারণ, সেখানে কোম্পানির ইংরেজ কর্মকর্তারা আগে থেকেই কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো। তারা জানতো, জলপাইগুড়িকে শান্ত রাখতে পারলে সমগ্র পূর্ববাংলা শান্ত থাকবে। পক্ষান্তরে ভারতের অন্যান্য প্রধান ছাউনিগুলোর মতো সেখানে যদি একবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, তবে তার তাপ গিয়ে লাগবে ঢাকা চট্টগ্রামের ছাউনিতে। সমগ্র বাংলা তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। স্বল্প সংখ্যক গোরা সেপাইয়ের ক্ষমতা হবেনা সে আগুন আয়ত্বে আনা। মীরাট, দিল্লী, ঝান্সী, অযোধ্যার মতো হবে এ অঞ্চলের অবস্থা।

তবু জলপাইগুড়িতে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিলো। স্থির হয়েছিলো দিনক্ষণ। কিন্তু কেমন করে যেন সে খবর ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো। ফলে ইংরেজ কর্মকর্তারা কঠোর

হস্তে তাদের দমন করেছিলো প্রস্তুতি পর্বেই। বন্দী করা হয়েছিলো নেতৃস্থানীয় সিপাহীদের। হত্যা করা হয়েছিলো একজনকে গুলী করে। আরেকজন পালানোর পথে ডুবে মরেছিলো নদীতে। বন্দীদের বিচার জলপাইগুড়িতে না করে পাঠানো হয়েছিলো কোলকাতায়। কোলকাতা তখন শান্ত। ইংরেজদের নিরাপদ আবাসস্থল।

এসব কারণেই জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকার বাঙালী সিপাহীদের কাছে নির্দেশ আসতে পারেনি। সারা ভারতে যখন সিপাহী বিদ্রোহের দাবানল ছড়িয়ে পড়েছিলো। পূর্ববাংলা তখন ছিলো শান্ত। কিন্তু অঘটন ঘটেছিলো দিল্লী হাতছাড়া হবার পর। সারা ভারতে আবার তখন ইংরেজ কর্তৃত্ব কায়েমের পথে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এই নদী-নালা আর বন-জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চলে দেশগতপ্রাণদের যাতায়াত সহজসাধ্য ছিলো না। সঠিক খবরও তাই পৌঁছোত না ঢাকার শিবিরে। স্বাধীনভাবে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করা স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক বাঙালি সৈনিকদের পক্ষে সম্ভব হতো না।

শেষ পর্যন্ত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যায় ঢাকায় খবর এলো,—চট্টগ্রামের ৩৪নং রেজিমেন্টের সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। অস্ত্র তুলে নিয়েছে হাতে। করেছে স্বাধীনতা ঘোষণা।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ইংরেজ কর্মকর্তারা সাবধান হয়ে গেলেন। লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে সে খবর পৌঁছোনর আগেই তাদের বশীভূত, প্রয়োজনবোধে খতম করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন ইংরেজ কর্মকর্তারা। কাউকে কিছু বুঝতে দেয়ার আগেই ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্যে অকস্মাৎ আক্রমণ চালানো হলো অস্ত্র গুদামে। সহজেই পরাস্ত করা গেলো পাহারাদার বাঙ্গালী সিপাহীদের। বন্দী করা হলো তাদের। ট্রেজারীর চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে প্রহরারত বাঙ্গালী সিপাহীদেরও অনুরূপভাবে করা হলো অস্ত্রহীন। বিনা কারণে বন্দী হলো তারা।

সাহস বেড়ে গেলো সেনাপতি লিড্‌স-এর। নিরীহদের উপর অত্যাচার চালাতে ইংরেজ সেনাপতিরা ছিলেন ওস্তাদ। বিনা উস্কানিতে তিনি আক্রমণ করলেন ঐতিহাসিক লালবাগ দুর্গ। আহ্বান করা হলো আত্মসমর্পণের। বীর বাঙালি সিপাহীরা প্রথমে অবাক হলেও কর্তব্য স্থির করতে তাদের সময় লাগলো না। তারা আত্মসমর্পণে রাজী হলো না। বরং বিপুল বিক্রমে প্রতিরোধ করলো ইংরেজদের অক্রমণ। পাল্টা গুলী ছুঁড়লো ইংরেজ সৈন্যদের লক্ষ্য করে। ইংরেজেরা আগেই প্রস্তুত ছিলো, পক্ষান্তরে বাঙালি সিপাহীরা ছিলো অপ্রস্তুত, নেতৃত্বহীন শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ। তবু তারা হাল ছাড়লো না। বীর বিক্রমে একতাবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে।

সারাদিন চললো তুমুল যুদ্ধ। দিন শেষে দেখা গেলো, চল্লিশজনের মতো বাঙালি যোদ্ধা নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো অনেকে। কিন্তু তারা ইংরেজদের ঢুকতে দিলো না দুর্গের অভ্যন্তরে। বীর বিক্রমে জীবিতরা চালিয়ে গেলো স্বাধীনতার সংগ্রাম। বাইরে থেকে খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হলো। তবু কয়েকদিন যুদ্ধ চললো এভাবে।

পানি ও খাদ্যের অভাবে শেষ পর্যন্ত তারা দুর্বল হয়ে পড়লো। আহতরা বিনা চিকিৎসায় আর পানীয় জলের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। সুস্থরা হারালো জীবনীশক্তি। লালবাগ দুর্গের আশেপাশের বাঙালি অধিবাসীরা রাত্রে শুনতে পেতো দুর্গের ভিতরে বীর বাঙালি সিপাহীদের আর্তনাদ। তারা পানি পানি বলে চিৎকার করতো। সে করুণ আর্তনাদে উদ্বেলিত হতো নিকটস্থ বেসামরিক অধিবাসীদের হৃদয়। এগিয়ে যেতো তারা পানি আর খাদ্য নিয়ে। কিন্তু নির্মম নিষ্ঠুর গোরা সৈন্যরা প্রতিহত করতো তাদের নির্মমভাবে। হত্যা করার ভয় দেখাতো। ফলে তারা বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করতো দেশগতপ্রাণ দেশীয় ভক্তদের সহমর্মীতায়। কিন্তু ভেতরে যেতে পারতো না। আসতে পারতো না কোনো উপকারে।

দেশীয় সিপাহীরা যখন বুঝলো দুর্গে আবদ্ধ থেকে যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়, তখন তারা যে কোনো উপায়ে গভীর রাত্রে কেল্লা ছেড়ে হেড কোয়ার্টার জলপাইগুলিতে যাওয়ার মনস্থির করলো। কেল্লার পাঁচিল ছিদ্র করে তারা দলে দলে অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়তে লাগলো। পালানোর সময়ও হলো গুলী বিনিময়। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ হলো বিভিন্ন স্থানে।

কিন্তু লেফটেন্যান্ট থিউস সুবিধা করতে পারলো না। বুড়িগঙ্গায় প্রহরারত জাহাজভর্তি তার গোরা সৈন্যরা পলাতক সব বাঙালী সৈন্যকে বন্দী করতে ব্যর্থ হলো। খবর চলে গেলো জলপাইগুড়িতে। ভয় পেয়ে গেলো সেখানকার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। ঢাকার বিদ্রোহী সৈন্যরা জলপাইগুড়ির দেশীয় সিপাহীদের সাথে মিলিত হতে পারলে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে। কেটে টুকরো টুকরো করবে স্বল্প সংখ্যক গোরা সিপাহী ও সেনাপতিদের।

পালানোর সময় যেসব দেশপ্রেমিক বিদ্রোহী সৈন্য গোরাদের হাতে বন্দী হয়েছিলো এবং আহত অবস্থায় যারা লালবাগ দুর্গে মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করেছিলো, তাদের উপর ঢাকার ইংরেজ সেনারা যে নৃশংসতা দেখিয়েছিলো ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

আজ যেখানে সুশোভিত 'বাহাদুর শাহ পার্ক' সেটা ছিলো তখন জঙ্গল ঘেরা। তাকে তখন বলা হতো 'আন্ডাঘরের ময়দান।' সেখানে জড়ো করা হয় বন্দী দেশপ্রেমিকদের। কোনো বিচারের ব্যবস্থা করা হয় না। আহতদের করা হয় না চিকিৎসার ব্যবস্থা। গাছে গাছে লটকানোর ব্যবস্থা করা হয় সেদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের। দেশপ্রেমিক সেনানীরা তখন বীরের মতো প্রতিবাদ করে। বলে,—'আমরা প্রথমে অস্ত্র তুলে নেইনি। প্রথম গুলীও চালাইনি। তোমরাই গুলী নিক্ষেপ করেছিলে আমাদের উপর। আমরা তাই প্রাণরক্ষার জন্যে পাল্টা গুলী ছুঁড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। আচমকা আক্রান্ত হয়ে আত্মরক্ষা করা কি অন্যায়?'

—পালালে কেন তাহলে?

—তোমরা খাদ্য, পানি প্রভৃতি বন্ধ করে দিয়েছিলো। গুলী ছোড়াও বন্ধ করোনি। পালানো ছাড়া আমাদের উপায় কি ছিল? তোমারা বিচারসভা বসাও। বিচারের দণ্ড আমরা মাথা পেতে নেবো।

কর্ণপাত করেনি ইংরেজরা বাঙ্গালি সিপাহীদের কথায়। গুরুত্ব দেয়নি তাদের আবেদনে। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে ছিল সবাইকে। ঢাকাবাসীদের ভয় দেখানোর জন্য লাশগুলো সরানো হয়নি। ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল ডালে ডালে। মৃতদেহ গলে গলে খসে পড়তে থাকে। শহরময় ছড়াতে থাকে দুর্গন্ধ। তবু লাশ সরানো হয় না। এমনি নিষ্ঠুর বীভৎস পন্থায় ইংরেজ কর্মকর্তারা সেদিন হত্যা করেছিলো দেশপ্রেমিক বাঙ্গালিদের।

এদিকে ঢাকার জরুরী খবর পেয়ে ভাগলপুরের কমিশনার দলবল নিয়ে যাত্রা করেছিলেন জলপাইগুড়ি অভিমুখে। তার উদ্দেশ্য ছিলো, মাঝ পথেই বিদ্রোহীদের পাকড়াও করা। তিস্তা নদীর এপারেই তাদের গতি রুদ্ধ করা। নদী পারাপারের সকল ব্যবস্থা বানচাল করা। কিন্তু তার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি। কিছু সৈন্য ধরা পড়লেও অধিকাংশ সৈন্য বিকল্প পথে নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল। গ্রামবাসীরা তাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলো। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সাধারণ মানুষ সেদিন সাহায্য করেছিলো সশস্ত্র দেশপ্রেমিক সিপাহীদের। অবস্থা বেগতিক দেখে বিদ্রোহীরা জলপাইগুড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেছিলো। যাত্রা করেছিলো নেপালের দিকে। ইংরেজরা সেটা বুঝতে পেরে নেপালের রাজা জঙ্গ বাহাদুরকে অনুরোধ করেছিলো বিদ্রোহীদের পাকড়াও করতে। সে অনুরোধ পালিত হয়েছিলো আদেশের মতো। তিনি তার সকল সম্ভাব্য ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন স্বাধীনতাকামীদের গ্রেফতার করার জন্য।

দেখা গেছে স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্যর্থতার মূলে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে এ দেশের বিশ্বাসঘাতক বেঈমান কতিপয় ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থের জন্য তারা নিঃসঙ্কোচে হাত মিলিয়েছে বিদেশীদের সাথে। বিসর্জন দিয়েছে জাতীয় স্বার্থ। নির্দয়ভাবে দমন করেছে দেশপ্রেমিকদের। বিজাতীয়দের বিজয়ের ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতা করেছে নির্দ্বিধায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ সেটা কখনও করেনি।

ইংরেজদের খয়ের খাঁ পরম সুহৃদ নেপালের রাজা জঙ্গ বাহাদুর বিশ্বস্ত অনুচরের মতো তার সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগান। তার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও দুর্ধর্ষ সেনাপতি রত্নমনি সিংকে আদেশ দেন, যে-কোনো উপায়ে বিদ্রোহীদের পাকড়াও করতে। কিন্তু নেপালের গ্রামবাসীদের সহায়তা পাওয়ার কারণে বিদ্রোহীরা নিরাপদে আত্মগোপন করতে সক্ষম হয় নেপালেরই গভীর অরণ্যে। তারপর পার্বত্য পথে পৌঁছে যায় অযোধ্যায়। ব্যর্থ হয় বেঈমান রত্নমনি সিং-এর অভিযান। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় বেঈমানদের নামের তালিকায় তার নাম উল্লেখ আছে উজ্জ্বল অক্ষরে।

ঠিক এমনি ঘটনা ঘটেছিলো চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের বীর সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিলো ঠিকই, কিন্তু কোনো ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করেনি। প্রথমে চট্টগ্রামের জেলখানা দখল করে বন্দীদের দিয়েছিলো মুক্তি। পুড়িয়ে দিয়েছিলো ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত সেনানিবাস। তারপর ট্রেজারী লুট করে নগদ তিন লক্ষ টাকা ও বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হাতি এবং ঘোড়ার পিঠে সেগুলো চাপিয়ে যাত্রা করেছিলো স্বাধীন ত্রিপুরার দিকে। ভেবেছিলো, ত্রিপুরার রাজার সাহায্যে আরও শক্তি-সামর্থ্য সংগ্রহ করে আক্রমণ করবে ইংরেজদের। তখন তাদের পরাস্ত করা সহজ হবে। বিদ্রোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বীর বাঙ্গালি হাবিলদার রজব আলী খাঁ।

নিশ্চিন্ত মনে রজব আলী খাঁ বিশাল বাহিনী নিয়ে ত্রিপুরার সীমান্তে গিয়ে দেখলেন, অগণিত সৈনিক সীমান্ত অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার কি ? জানা গেলো, চট্টগ্রামের কমিশনার খবর পাঠিয়েছেন ত্রিপুরার রাজার কাছে। তথাকথিত এই স্বাধীন নৃপতিকে তিনি বলেছেন,—'আপনার বিশ্বস্ততার পরীক্ষা দেওয়ার সময় এসেছে। আপনাকে আমরা বিশ্বস্ত সুহৃদ হিসেবেই জানি। চট্টগ্রামের বাঙ্গালি সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। তারা চলে গেছে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নেয়ার জন্য। কোনো প্রকারে তারা যেন ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে না পারে। জীবিতও যেন পালাতে না পারে অন্যত্র। চট্টগ্রামে আমাদের গোরা সিপাহী নেই। তাই তাদের দমন করার পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হলো আপনাকে। আশা করি, আপনি আমদের বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখবেন। পরিচয় দেবেন আন্তরিক সদিচ্ছার।'

নেপালের রাজা জঙ্গ বাহাদুরের মতো ত্রিপুরার রাজাও স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালি সিপাহীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শনের সুযোগটা নষ্ট করেন নি। বিদেশী বন্ধুদের কৃপালাভের আশায় নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার কুমতলবে তিনি তার সশস্ত্র বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছিলেন স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালি বীরদের বিরুদ্ধে। আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাদের উপর। লুণ্ঠন করে নিয়েছিলেন তাদের টাকা-পয়সা, গোলা-বারুদ। হত্যা করেছিলেন অনেক সৈনিককে। বাধ্য হয়ে বীর সিপাহীরা নতুন পথে মোড় নিয়েছিলো। নিরাপদ আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলো মনিপুরে রাজ্যের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে পথেও বাধা আসে।

মেজর বাইঙ্গের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সৈন্য অকস্মাৎ আক্রমণ করে তাদের। সিলেটে সেনানিবাসের সৈন্য ছিলো তারা। লাতু নামক স্থানে দু'পক্ষের মরনপণ যুদ্ধ হয়। অগণিত সিপাহী প্রাণ হারায় সে যুদ্ধে। ইংরেজ সেনাপতি মেজর বাইঙ্গ হন নিহত। কিন্তু বিদ্রোহীরা সার্বিক জয়লাভে হয় ব্যর্থ। ফলে গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিতে হয় তাদের। অর্থহীন, খাদ্যহীন, আশ্রয়হীন সৈন্যদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি ইংরেজদের মোকাবিলা করা। চিরদিনের মতো হারিয়ে যায় তারা মনিপুরের গভীর জঙ্গলে। ত্রিপুরার রাজা এবং কয়েকজন জমিদার নাকি ওদের খোঁজ করার জন্য অনেকদিন ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলো তাদের সৈন্যবাহিনী ও পাইক পেয়াদারা। ঠিক এমনি ঘটনা ঘটেছিল কাশ্মীরে। সেখানকার তথাকথিত স্বাধীন রাজা গোপাল সিং চরম শত্রুতা করেছিলেন দেশপ্রেমিক সৈনিকদের সাথে। সহযোগিতার হাতে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অত্যাচারী ইংরেজদের প্রতি। খয়ের খাঁ হতে চেয়েছিলেন মেজর নিকলসনের কাছে। কাশ্মীরে আশ্রয়প্রার্থী পলাতক সিপাহীদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজ সেনাপতির হাতে।

২৪শে জুলাই মরদানের ৫৫নং রেজিমেন্টের দেশীয় সৈন্যরা গোপন খবর পেলো পেশোয়ার থেকে একদল অনুগত সৈন্য আসছে। বাঙ্গালি সিপাহীদের নিরস্ত্র করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ভয় পেলো মরদানের সৈন্যরা। তারা জানতো অস্ত্রশূন্য করার অর্থ কি ? তাই তারা দল বেঁধে গেল তাদের প্রিয় কর্নেলের কাছে। তার কাছে জানতে চাইলো ব্যাপারটা। তিনি নিরুত্তর। কিছুই বলতে পারলেন না। চোখ দিয়ে শুধু তার গড়িয়ে পড়লো অশ্রু।

সিপাহীরা বুঝলো, কর্নেল জানেন ব্যাপারটা। তাকে উপেক্ষা করেই হয়তো হচ্ছে সবকিছু। তিনি মর্মাহত। তাই অপারগতার বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করেছেন। তাকে উপেক্ষা করে, হয়তো তার নিষেধ অমান্য করেই তাদের উপর অত্যাচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই তিনি মর্মাহত। নিরুত্তর।

শঙ্কা বেড়ে গেলো ৫৫নং রেজিমেন্টের দেশীয় সৈনিকদের মনে। তারা কর্নেলকে আবার প্রশ্ন করলো,—'স্যার, আপনি বলুন, পেশোয়ার থেকে কেন সৈন্যবাহিনী আসছে ? সত্যি কি তারা আমাদের নিরস্ত্র করতে চায় ? চায় শাস্তি দিতে ? আপনার মতামত কি তারা উপেক্ষা করেছে ? আপনি কি আমাদের রক্ষা করতে অপারগ ? আপনি কেন এতো মুষড়ে পড়েছেন ?'

এবার মাথা উঁচু করলেন কর্নেল। কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন,—'আমার দেশীয় ভাইরা আমাকে অবিশ্বাস করেছে। তাতেই আমি ভেঙ্গে পড়েছি। তবু হাল ছাড়িনি। তোমরা আমাকে যেমন বিশ্বাস করো, আমার উপর আস্থা রাখো, আমিও তেমনি তোমাদের বিশ্বাস করি। তোমাদের ভালো-মন্দের জন্য দায়ী বলে মনে করি। কিন্তু তোমাদের বিশ্বস্ততার দাম যদি আমি দিতে না পারি, তবে আমার জীবনের মূল্য কোথায় ? বেঁচে থাকার সার্থকতা কি ?'

—তা হলে আমরা কি করবো ? রেজিমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে যাবো, আত্মরক্ষা করবো ?

—এখনো ঠিক করে বলতে পারছি না। তারা যদি এসেই যায়, আর তোমাদের অস্ত্রশূন্য কিংবা হত্যা করে, তবে তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। বিপদ যদি সত্যি ঘনিয়ে আসে, আমি যদি একান্তই নিরুপায় হই, তাহলে তোমরা নিজেদের পথ দেখো। ব্যর্থতার জন্য আমাকে ক্ষমা করো। বিদায়।

সৈনিকদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কর্নেল দরজা বন্ধ করলেন। একবুক দুঃখ, বেদনা, হতাশা আর দুশ্চিন্তা নিয়ে সৈনিকরা তাবুতে ফিরে গেলো।

ভোর রাতে কর্নেলের বাসার সেন্ট্রি খবর দিলো, কর্নেল সাহেব নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। শেষ রাতে পেশোয়ার থেকে আগত এক ইংরেজ কর্মকর্তার সাথে কথা কাটাকাটির পরই তিনি এই আত্মঘাতী কাজ করেছেন।

আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে। শিবির ত্যাগ করার কথা চিন্তা করতে লাগলো তারা। তাদের পক্ষে কথা বলার, তাদের রক্ষা করার মতো আর কেউ রইলো না। এমতাবস্থায় শিবির থেকে স্বেচ্ছায় বন্দী হওয়া মানে আত্মহত্যা করা। তার চাইতে প্রাণে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। যে কোনো উপায়ে মিলিত হতে হবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দলে। মরতে হলে সংগ্রাম করেই মরবো। সেই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন কর্নেল সাহেব।

নানা মুনির নানা মত। কোনদিকে যাবে ? কার নেতৃত্বে সবাই চলবে ? অস্ত্রশস্ত্র নেবে কিনা প্রভৃতি বিষয় যখন আলোচনা হচ্ছে ঠিক তখনই পেশোয়ার থেকে নতুন বাহিনী আসার খবর পৌঁছাল। তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন কর্নেল চুট। কর্নেল চুটের নাম

শুনেই তাদের বুক কেঁপে উঠলো। পালানোর ব্যাপারে যাদের মনে সামান্যতম সন্দেহ ছিল তারাও ঝেড়ে উঠলো। দেরী না করে শলা-পরামর্শ ব্যতিরেকেই টাকা-পয়সা ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কেটে পড়লো। নবাগত সৈন্যরা শিবিরে পৌছানোর আগেই কাজটা হয়ে গেলো। পেছনে পড়ে রইলো তাদের প্রিয় কর্নেলের মৃতদেহ।

কিছুটা বেলা হতেই মেজর নিকলসন বুঝে নিলেন ব্যাপারটা। তিনি চেয়েছিলেন বেলা দশটার মধ্যেই ৫৫নং রেজিমেন্টের সকল সিপাহীকে অস্ত্রশূন্য করতে। তারপর বন্দীখানায় আটক রাখতে। বিদ্রোহ ঘটানোর সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে। সে কাজে সহায়তা করার জন্যই তিনি পেশোয়ার থেকে আনিয়েছিলেন অনুগত বাহিনী, প্রচুর গোলা-বারুদ, কামান-বন্দুক। সবই কি ব্যর্থ হবে ? বেটাদের কি শাস্তি দেওয়া যাবে না ? অসম্ভব। ওদের দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করতেই হবে। ওরা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলো বলেই এতো তোড়জোড়, এতো প্রস্তুতি। তাদের রেজিমেন্টের কর্নেল আমাদের গোপন রিপোর্ট বিশ্বাস করেন নি। তিনি ওদের পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। তার কথা শোনা হয়নি বলে তিনি আত্মহত্যা করলেন। এতো সব ঘটনার পর বেটারা পালাবে ? পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করবে ? যোগ দেবে শত্রু দলে ? কিছুতেই ওদের দুরাশা চরিতার্থ হতে দেয়া যাবে না।

৫৫নং রেজিমেন্টের সৈন্যরা কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলো। ধারে কাছে কোনো বিদ্রোহী ইউনিট না থাকায় তারা এমন পরিকল্পনা করেছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, কোনো রকমে একবার কাশ্মীরে প্রবেশ করতে পারলে তারা নিরাপদ। ইংরেজদের কতৃর্ত্বের বাইরে গেলে ভয় থাকবে না। কাশ্মীরের রাজা গোপাল সিং নিশ্চয় তাদের আশ্রয় দেবেন, খাদ্য দেবেন। তারপর সুযোগ মতো স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার পথে সহায়তা করবেন। কারণ তিনি নিজেও স্বাধীন রাজা।

তাছাড়াও আরেকটা কারণ ছিলো। এই পলাতক সিপাহীদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। কাশ্মীরের রাজাও হিন্দু। নিশ্চয় তিনি জাত ভাইদের প্রতি একটু বেশি সদয় হবেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জানতেন না যে বুর্জোয়াদের কোনো জাত থাকে না। থাকে না কোনো ধর্ম। এরা স্বার্থপর সংকীর্ণমনা। নিজেদের স্বার্থের জন্য এরা সর্বপ্রকার হীন কাজ করতে পারে। মায়া-মমতা, মানবতা, জাতীয়তা এদের কাছে কথার কথা।

সৈনিকরা প্রথমে সোয়াতের দিকে গিয়েছিল। তাদের সাথে ছিলোনা কোনো যানবাহান। ছিলোনা পর্যাপ্ত খাদ-সামগ্রী। নির্জন বন-জঙ্গল দিয়ে তাদের চলতে হচ্ছিল। সে পথ বড় বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ। সোয়াতে নিরাপদ আশ্রয় না পেয়ে তারা যাত্রা করেছিলো যশানে'র দিকে। সে পথেও নিরাপত্তার অভাব অনুভূত হওয়ায় তারা মোড় ঘুরে কোহিস্তানের মধ্যদিয়ে আরও দুর্গম পথে কাফেলা পরিচালনা করেছিলো। এগিয়ে গিয়েছিলো গিলগিটে'র সীমানায়। তারপর প্রবেশ করার কথা ছিলো কাশ্মীরে। উপবাসে আর পথশ্রান্তিতে তারা তখন কাহিল। কোনো প্রকারে কাশ্মীর প্রবেশ করতে পারলেই তাদের খাদ্যের অভাব ঘুচে যাবে। পাবে নিরাপদ আশ্রয়। বুক ভরা তাদের আশা।

ওদিকে মেজর নিকলসন টের পেয়েই ঘোড়সওয়ার নিয়ে দ্রুত ধাবিত হয়েছিলেন তাদের পিছনে। অনেক কষ্টে তিনি বন্দী করতে পেরেছিলেন একশত পঞ্চাশজন

দেশপ্রেমিককে। বন্দী করে এনেছিলেন তাদের মরদানে। পথচলার ক্লান্তিতে নাকি মারা গিয়েছিল সমপরিমান। তবে চারশতের অধিক সৈন্য মেজর নিকলসনের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পেরেছিল সোয়াতের পথে। তারাই আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন কাশ্মীরে।

মেজর নিকলসন কোনো বিচার-সালিশ ছাড়াই ১০ই জুন চল্লিশজন নেতৃস্থানীয় সিপাহীকে হাজির করেছিলেন প্যারেড গ্রাউন্ডে। তার আগেই সেখানে চল্লিশটা কামান পরপর সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রত্যেকটা কামানের মুখে একজন করে সিপাহীকে বেঁধে তিনি আদেশ দিয়েছেন, 'ফায়ার'। এক সঙ্গে চল্লিশটা কামান সশব্দে গর্জে উঠেছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়েছিল চল্লিশজন নিরপরাধ নিরীহ দেশপ্রেমিকের দেহ। নিঃশেষ হয়েছিল তাদের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা। তাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কোনো দিন জানতে পারেনি তাদের শেষ ইচ্ছের কথা। মৃতদেহেরে সৎকার সুযোগও পায়নি কেউ।

এই হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়েও নিকলসনের প্রাণ ভরেনি। তিনি কমিশনার এডওয়াডিশ-এর মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কাশ্মীরের রাজা গোপাল সিং-এর কাছে। তাকে বলা হয়েছিল, কোনো বিদ্রোহী যেন তার রাজ্যে ঢুকতে না পারে। আশ্রয় না পায়। ধরলে যেন পাঠানো হয় পেশোয়ারে। বিশ্বাসঘাতকতার আসল শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

কাশ্মীরের জারা গোপাল সিং অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন কমিশনারের অনুরোধ। কড়া প্রহরা নিযুক্ত করেছিলেন কাশ্মীর রাজ্যের পার্বত্য সীমান্তে। একটা পুরো রেজিমেন্ট তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন সে ব্যাপারে। তার বাহিনীর প্রতি আদেশ দেওয়া হয়েছিল বন্দী নয়, খতম করে দিতে হবে। ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।

বাধ্য হয়ে বিদ্রোহী সিপাহীরা কাশ্মীরে প্রবেশের আশা ত্যাগ করে পাহাড়-পর্বত আর বন-জঙ্গলে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে লাগলো। আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন, চিকিৎসাহীন অবস্থায় কতোদিন শরীরের সক্ষমতা রক্ষা করা যায় ? ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো অনেকে। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে যারা বেঁচেছিল তারা পড়লো ধরা। ইংরেজ সৈন্যরা তাদের নিয়ে এলো তাবুতে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হলো সবাইকে। মৃত্যুকে তখন ওরাজয় করে নিয়েছে। তাই মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে শুধু একটা দাবী জানালো,— 'আমাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হোক। মৃত্যুতে আমাদের দুঃখ নেই। দেশের জন্যে মরতে আমরা ভয় পাইনে, কিন্তু কুকুরের মতো যেন ফাঁসিতে ঝোলানো না হয়। আমরা বীর। বীরের মর্যাদা নিয়েই মরতে চাই। কামানের গোলায় আমাদের হত্যা করা হোক।'

তাদের শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন নিকলসন। কামানের গোলায় হত্যা করা হয়েছিল সবাইকে, কিন্তু কাশ্মীরের তথাকথিত মহারাজ গোপাল সিং দেশবাশীর সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, পদ-লেহন করেছিলেন ইংরেজদের, সে দুঃখ রাখার জায়গা কোথায় ? স্বাধীনচেতা সৈনিকদের সাথে যখন এমনি করে দেশীয় রাজন্যবর্গ বিশ্বাসঘাতকতা করছিলেন, সেই সময় কিন্তু কিছু ইংরেজ সৈনিক এবং কর্মচারী বিদ্রোহীদের সাথে সহমর্মীতা দেখিয়েছিলেন। তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেননি

স্বাধীনতাকামী সৈনিকদের। বরং কেউ কেউ সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন। সহায়তা দেখিয়েছিলেন মুক্তি-যোদ্ধাদের।

এমনি একজন ব্যক্তিক্রমধর্মী ইংরেজ সেনাপতির কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ৯৩নং হাইল্যান্ডার-এর অন্যতম কর্মকর্তা সার্জেন্ট ফরবেশ মিচেল বিবৃত করেছেন এই ইংরেজ সেনাপতির কথা। তিনি ঘটনাটা যার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন সে ছিল একজন অতি সাধারণ সৈনিক। তাই সেই ব্যতিক্রমধর্মী ইংরেজ সেনাপতির নামে সে স্মরণে আনতে পারেনি।

সার্জেন্ট মিচেল বলেছেন,—'১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগে বেরিলীর সৈন্য বাহিনীতে অনেক ইংরেজ সেনার মতো একজন মেজরও ছিলেন। ধরা যাক তার নাম মেজর হিরো। তিনি ভারতীয়দের সাথে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন। তাদের ঘৃণা করতেন না, পরও ভাবতেন না। বরং ভাইয়ের মতো ভালোবাসতেন। ভারতীয় সৈনিকরাও তাদের অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করতো। তারা তার ভালোবাসার মর্যাদা দিতো। হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করতো না। মেজর হিরো নাকি প্রায়ই বলতেন,—আমিও তোমাদের একজন। তোমাদের দেশের অর্থেই আমার দেহ পুষ্ট। আমি ভারতীয় বাহিনীর সৈনিক। ভারতের মঙ্গলের জন্যই আমাদের কাজ করা উচিত। আমার শক্তি সামর্থ্য সে কাজেই নিয়োজিত। সুদিনে যেমন তোমাদের সাথে আছি দুর্দিনেও তেমনি থাকবো।'

চলছিল ভালোই। হঠাৎ ভারতীয় সৈন্যরা করলো বিদ্রোহ। আরম্ভ হলো সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম। মানুষ যেন হিংস্র পশুতে পরিণত হলো। এতো দিনের অনুগত সৈন্যরা সুযোগ পেলেই হত্যা করতে লাগলো ইংরেজ সেনাদের। প্রতিশোধ নিতে লাগলো অতীত নিপীড়ন আর অত্যাচারের। পক্ষান্তরে ইংরেজ কর্মকর্তারাও কান্ড-জ্ঞানহীনের মতো বিদ্রোহ দমনের নামে নৃশংসতায় চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলো। বিচার-বিবেচনা ছাড়াই নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলো ভারতীয়দের। ন্যায় অন্যায়বোধ তারা হারিয়ে ফেললো। একটা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য হাজারটা অন্যায় করতে লাগলো বিদ্রোহের দাবানল তাই ছড়িয়ে পড়লো দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সর্বত্র প্রতিহিংসার প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো। সুযোগের সুব্যবহার করতে কেউই কার্পণ্য করলো না।

কিন্তু মেজর হিরো ছিলেন এসবের ব্যতিক্রম। বেরিলীর সিপাহীরা যখন বিদ্রোহ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, তখন তিনি যোগদান করেন তাদের দলে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান রাখার আগ্রহ প্রকাশ করে তিনি বলেন,—'অত্যাচারী কোম্পানীর অধিকার নেই ভারতবর্ষ শাসন করার। তাদের অন্যায় রাজত্বের অবসান হওয়া উচিত।'

বেরিলীর সৈন্যবাহিনী সমগ্র বেরিলী করে মুক্ত। তারপর যাত্রা করে দিল্লী অভিমুখে। মেজর হিরোও সহগামী হন তাদের।

সম্রাট বাহাদুর শাহকে তখন বসানো হয়েছে দিল্লীর সিংহাসনে। শত্রু মুক্ত দিল্লী। জেনারেল বখত খাঁ তখন প্রধান সেনাপতি। সম্রাট বাহাদুর শাহ মেজর হিরোর পরিচয় পেয়ে আর তার কর্তব্য-নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সহকারী প্রধান সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত

করেন। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত পারদর্শী মেজর। ফলে শৃঙ্খলহীন নতুন বাহিনীকে সুগঠিত করার ব্যাপারে তাকে পরিশ্রম করতে হয় সবচাইতে বেশি। রাতদিন তিনি অবিশ্রান্তভাবে কাজ করে যান।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। ব্যর্থ হয়েছিলেন নানা কারণে। ইতিহাস তাকে দায়ী করবে না। শিখ সিপাহীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং দিল্লীর কতিপয় প্রভাবশালী অধিবাসীর বেঈমানীর কারণে ইংরেজ বাহিনী পাল্‌টা আঘাত হেনে পাঁচ মাস পরে দিল্লী পুনর্দখল করে। এই দূর্যোগ মুহূর্তে মেজর হিরো যে পরিশ্রম করেন যে মানসিক শক্তির পরিচয় দেন তা দেশীয় সিপাহীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল অকাতরে প্রাণ দিতে।

চূড়ান্ত পরাজয় অবধারিত হওয়ায় দিল্লীর অবরোধ উঠিয়ে ভারতীয় সৈন্যরা যখন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাত্রা করে, মেজর হিরোও তখন তাদের সঙ্গী হন। ইচ্ছে করলে এই সময় তিনি দিল্লী থেকে যেতে পারতেন। যোগ দিতে পারতেন স্বদেশীদের সাথে। বলতে পারতেন, আমি কৌশলে তোমাদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছি। কিন্তু তিনি তেমন বেঈমানী করেন নি। হাত মেলাননি কোম্পানীর নিষ্ঠুর সৈনিকদের সাথে। দিল্লীর বাইরে গিয়ে সমবেত হন সকলে। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে ত্রিশ হাজার সৈন্য মোতায়েন করেন মথুরায়। যমুনা নদী অতিক্রমের ব্যবস্থা করতে হিমসিম খান। নদীতে নৌকোর অস্থায়ী পুল তৈরির ব্যবস্থা করেন। তিনি একযোগে কাজ করেন বখত খাঁ ও ফিরোজ শাহের সাথে।

এরপর তিনি চলে যান লৌখনো এ। রাজা নৃপতি সিং-এর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন তিনি। পতন ঘটান রুইয়ার দুর্গ।

তারপর চলে যান অযোধ্যায়। অংশ গ্রহণ করেন নবাবগঞ্জের যুদ্ধে। সে যুদ্ধে দুর্ভাগ্যবশত বখর খাঁ নিহত হন। সিপাহীরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। সারা ভারতবর্ষে তখন খন্ড খন্ড যুদ্ধ চলছে। কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্ব, অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থের অভাবে মার খাচ্ছে স্বাধীনতাকামীরা। তাই বাধ্য হয়ে রাপ্তি নদী পার হয়ে হতোদ্যম দেশীয় সৈন্যরা আশ্রয় নেয় নেপালের গভীর জঙ্গলে। সেখানেও শান্তি ছিল না তাদের। নেপাল রাজা ছিলেন তাদের শত্রু। ইংরেজদের বন্ধু।

ততদিন ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া রাজকীয় ফরমান জারী করেছেন। কোম্পানী রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষকে তিনি সরাসরি ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করেছেন। ক্ষমা ঘোষণা করেছেন বিদ্রোহিদের প্রতি। উপায়ন্তর না দেখে মেজরের সঙ্গী ভারতীয় সৈনিকরা ইংরেজ শিবিরে আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে। মেজর হিরো বাধা দিয়ে বললেন,—'ওদের বিশ্বাস করো না। ধরা দিলেই ওরা তোমাদের হত্যা করবে। বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝোলাবে। ওরা বেঈমান। ভারতের ইংরেজ অফিসাররা রাণীর আদেশ পালন করবে না। প্রতিহিংসায় তারা এখনো উন্মাদ।'

এই সময় একজন সৈনিক এসে জানালো, যারা ইংরেজ শিবিরে আত্মসমর্পন করেছে, সাহেবরা তাদের পথ খরচ দিয়ে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সে খবর শুনে

মেজর হিরোর নিষেধ প্রথম ও শেষবারের মতো অমান্য করে হতাশাগ্রস্ত সিপাহীরা ইংরেজ শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। কারণ, তখন নেপালী বাহিনীর আক্রমণের সম্ভাবনাও ছিল। ভবিষ্যতের কোনো আলো তখন তারা দেখতে পাচ্ছিলো না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে। যাবার সময় দেশীয় সিপাহীরা মেজর হিরোকে সঙ্গে নিতে চাইলো। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। অনুনয় বিনয় করলো, কাকুতি মিনতি জানালো। তবু সাহেবকে সম্মত করাতে পারলো না। তিনি তার মতে রইলেন অটল। বললেন,—'তোমরা ভুল করছো। দেশ-প্রেমিকেরা কখনো শত্রুর কাছে আত্মসমর্পন করে না। শত্রুর কাছে করুণা ভিক্ষার চাইতে জঙ্গলে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। তোমরা যেয়ো না'।

মেজর হিরো ব্যর্থ হলেন। হতাশাগ্রস্ত সৈনিকরা নেপালের জঙ্গল ছেড়ে ভারতে প্রবেশ করলো ভবিষ্যতের আশায়। যাবার সময় নিরুৎসাহিত হতোদ্যম ব্যথাহত সৈনিকরা চোখের পানিতে বুক ভাসালো। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলো মেজর হিরোর কাছে। তাকেও সহগামী হবার অনুরোধ করলো। কিন্তু কিছুতেই মেজর হিরোকে রাজী করাতে পারলো না। তিনি বললেন,—'তোমাদের ঘর আছে, ছেলে-মেয়ে আত্মীয় স্বজন আছে, ভবিষ্যৎ আছে, তাই তোমরা আত্মসমর্পন করতে যাচ্ছো। আমার কী আছে ? আমার আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, দেশ নেই। এই গভীর জঙ্গলই আমার শেষ আশ্রয়স্থল। অবশিষ্ট জীবন আমার এই বনভূমিতেই কাটবে। জঙ্গলের স্বাধীন পশুপাখি আর প্রাণীদের সাথে অতিবাহিত হবে আমার অবশিষ্ট জীবন। তোমরা সমাজে ফিরে গিয়ে সুখী হও। ছেলে-মেয়ে আত্মীয়-স্বজনের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দিত হও। এই কামনা আমার আন্তরিক। বিদায় ভাইসব, বিদায়।

পাঁচ

একটু পেছনে যেতে হয় আমাদের। বলতে হয় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়ার কথা।

১৮৫৩ সালে ইংরেজ সরকার 'এনফিল্ড' নামে এক ধরনের নতুন রাইফেল আমদানী করে ভারতবর্ষে। দেশীয় হিন্দু মুসলিম সিপাহীদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয় সে রাইফেল। এতে ব্যবহার করার জন্যে বিলেত থেকে পাঠানো হয় চর্বিমাখা কার্তুজ। পরবর্তীকালে অবশ্য কোলকাতার দমদম ও মীরাটের অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে স্থানীয়-ভাবে সে কার্তুজ তৈরি হতে থাকে। রাইফেলে ঢোকানোর আগে দাঁতে ছিঁড়তে হতো কার্তুজের চর্বি অংশটুকু। আপত্তি করার কোন কারণ ছিল না দেশীয় সিপাহীদের। কিন্তু একদিন ঘটলো অঘটন।

ব্যারাকপুর সেনানবাসে হঠাৎ একদিন এক ফকির এসে গোপনে বলে গেলেন, হিন্দু-মুসলমান সিপাহীদের জাত মারার জন্যে ইংরেজ সরকার চর্বিমাখা কার্তুজ প্রচলন করেছে। শূকর আর গরুর চর্বি মাখানো হয় ঐ কার্তুজে। তোমরা আর ঐ কার্তুজ ব্যবহার করবে না। আপত্তি জানাবে। দরকার হলে বিদ্রোহ করবে।

ফকির চলে গেলে কথা ছড়িয়ে পড়লো সিপাহীদের মধ্যে। মঙ্গল পান্ডে নামক একজজন ব্রাহ্মণ সিপাহী প্রচার করলো খবরটা। সিপাহীরা ক্ষেপে গেলো। সত্যিকার ব্যাপারটা তারা জানতে চাইলো কমান্ডারের কাছে। কমান্ডার লিখলেন উপরওয়ালার দফতরে। তারা বিষয়টার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। সেনাবাহিনীতে চাকরি করতে এসে এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হলো।

কর্তৃপক্ষ পাশ কেটে গেলেও এই সময় টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতা লিখেছিলেন, কার্তুজ যাতে সহজে রাইফেলে ঢোকানো যায় সেজন্য তার মুখে চর্বি মাখানো হয়। সরকার খরচ কমানোর জন্য কন্ট্রাক্টরকে মোমের বদলে ছাগলের চর্বি মাখানোর অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু ঠিকাদার বেশি লাভের আশায় গরু ও শুকরের চর্বি সরবরাহ করেছে। তাই মোমের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে চর্বি। আর ছাগলের পরিবর্তে কন্ট্রাক্টর কাজে লাগিয়েছে গরু শুকরের চর্বি। শুধুমাত্র বেশি লাভের আশায় করেছে এমনটি।

সরকারীভাবে এই রিপোর্ট স্বীকার করা হয় না। ফলে সিপাহীরা একজন কুলীন হিন্দু ও একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে কারখানা পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া অনুরোধ জানায়। সরকার সে দাবীও পুরণ করে না। ধর্মপ্রাণ সিপাহীরা এতে ভয়ানক রেগে যায়। তারা বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করতে থাকে।

অযোধ্যার ৭নং দেশীয় বাহিনীর বিদ্রোহের পাঁয়তারা আবিষ্কার করলেন হেনরি লরেন্স। প্যারেড গ্রাউন্ডে শাস্তির হুমকি দিলেন। কোর্ট মার্শালের ভয় দেখালেন। কাজ হলো উল্টো। ক্ষিপ্ত সিপাহীরা ভয় পেলো না। একশত বিশজন সিপাহী হাতের রাইফেল রাখলো মাটিতে। অস্বীকার করলো কার্তুজ ব্যবহার করতে। বেশীর ভাগ সিপাহী শিবির ছেড়ে চলে গিয়েছিল আগেই অপমানিত হলেন লরেন্স। কঠোর সাজা দেওয়ার হুমকি দিলেন বিদ্রোহীদের।

ওদিকে কয়েকদিন পরে ব্যারাকপুর শিবিরে ঘটলো আরেক ঘটনা সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে হঠাৎ ক্যাম্পের বাইরে এসে চিৎকার করতে লাগলো,—'বেরিয়ে এসে ভাইসব। অস্ত্র তুলে নাও হাতে। হত্যা করো ইংরেজদের। ওরা ইচ্ছে করে আমাদের জাত মেরেছে।'

মঙ্গল পান্ডের আহ্বানে দেশীয় সিপাহীদের সাড়া দেওয়ার আগেই সেখানে হাজির হলেন লেফটেন্যান্ট বঘ। ঘোড়ার পিঠে বসেই তিনি কড়া মেজাজে মঙ্গলকে বললেন,—'চুপ করো ব্লাডি। ফিরে যাও তাবুতে।'

—তুমি ফিরে যাও। চলে যাও নিজ দেশে। এদেশে তোমাদের থাকতে দেবো না। ভালোয় ভালোয় না গেলে গুলী চালাবো।

—এতো বড় বেয়দবি ? দেখবে মজা ?

বঘ কোমরবন্ধ থেকে তরবারি বের করলেন। এগিয়ে এলেন মঙ্গল পান্ডের দিকে। হত্যা করতে উদ্যত হলেন তিনি। উপায়ান্তর না দেখে পান্ডে গুলি ছুড়লো বঘকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যচ্যুত হলো গুলী। লাগলো ঘোড়ার গায়ে। পড়ে গেলো ঘোড়াটা। বঘ সাহেব আক্রমণ করলেন পান্ডেকে। বন্দুক ছেড়ে পান্ডে হাতে নিলো তরবারি। পাল্টা আক্রমণ করলো বঘকে। নিপুণ হাতে আঘাত করলো তারই লেফটেন্যান্টকে। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ডাকসাঁইটে লেফটেন্যান্ট। উন্মাদের মতো তার আহত দেহের উপর আঘাতের পর আঘাত হানলো ক্ষিপ্ত পান্ডে। নিহত হলেন লেফটেন্যান্ট বঘ।

খবর পেয়ে ছুটে এলেন মেজর হটসন। আক্রমণ করলেন পাগলপ্রায় মঙ্গল পান্ডেকে। কিন্তু পেরে উঠলেন না তিনিও। তাকে পরাজিত হতে হলো দেশীয় সিপাহীদের হাতে। তারপর এলেন জেনারেল হেয়ারসি। তিনি কাবু করতে পারলেন পান্ডেকে। বন্দী করা হলো আহত মঙ্গল পান্ডকে। দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইশ্বরী পান্ডে। তাকেও পাকড়াও করা হলো।

সামরিক আদালতের রায়ে দুই পান্ডেকে ফাঁসি দেওয়া হয়, ২১শে এপ্রিল। ব্যারাকপুরের মর্মান্তিক খবর চলে যায় বাহরামপুরে। সেখানকার সিপাহীরাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানায়। অস্ত্র ধরতে চায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে। কিন্তু অনেক কষ্টে সেখানকার কর্মকর্তারা বাগে আনে তাদের। নেতাজাতীয় সিপাহীদের করা হয় বরখাস্ত। অন্যদের করা হয় অস্ত্র শূন্য। সবাইকে দেওয়া হয় কঠোর শাস্তি। কিন্তু বিদ্রোহের আগুন তাতে নেভে না। অসন্তুষ্ট সিপাহীদের অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে বিদ্রোহের আগুন। সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকে তারা।

তখনকার দিনে সবচেয়ে বড় সেনানিবাস ছিল মীরাটে। সেখানকার দেশীয় সিপাহীরাও এনফিল্ড রাইফেল ব্যবহারে অসন্মতি জানালো। চার্বি মাখা কার্তুজ পরিবর্তন করতে বললো। অন্যান্য শিবিরের তুলনায় মীরাটে ইংরেজ অফিসার আর গূর্খা সৈন্যদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ইংরেজরা তাই দেশীয় সিপাহীদের প্রতি ছিল দরদহীন। বিশেষ করে ৩নং অশ্বারোহী বাহিনীর কমান্ডার কর্নেল স্মীথ ছিলেন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তিনি যখন শুনলেন, দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব বিরাজ করছে—তখন তিনি ২৩শে এপ্রিল প্যারেড গ্রাউন্ড থেকে নব্বইজন নেতা দেশীয় সিপাহীকে আলাদা করলেন। কঠোর শাস্তি দিলেন সারাদিন ধরে। কোর্ট মার্শাল বসালেন তাদের বিরুদ্ধে। বিচারে জেল হলো অনেকের।

ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল কয়েকদিন। ৯ই মে দেশীয় সিপাহীরা দেখলো তাদের সহকর্মীদের পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। পায়ে পরানো হয়েছে লোহার শক্ত বেড়ি। পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। কর্নেল স্মীথ মনে করেছিলেন বন্ধুদের দুরবস্থা দেখে দেশীয় সিপাহীরা ভয় পাবে। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হবে। কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করার পরিণতির কথা হৃদয়ঙ্গম করবে। কিন্তু ফল হয়েছিল বিপরীত। চোখ ফোটে তাদের পানি বেরিয়েছিল। বন্ধুদের শোচনীয় পরিণতিতে তারা অন্তরে ব্যথা পেয়েছিল। ইংরেজ রাজ্য-বিস্তারে অতীতে তাদের ত্যাগ তিতিক্ষা আর বীরত্বের কথা স্মরণ করেছিল। পুরস্কারের পরিবর্তে বিনা কারণে অপমানকর শাস্তি তাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। অধীনতার মর্মবেদনা তারা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল ইংরেজ নিধনের। ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে।

এ সম্বন্ধে গাফ নামে একজন তরুণ অফিসার লিখেছিলেন,—'সাজা-প্রাপ্ত সিপাহীদের মধ্যে অনেকেই ছিল বেশ বয়স্ক। তারা অতীতে ইংরেজ প্রভুদের পক্ষে বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে ইংরেজদের বিজয় নিশ্চিত করেছে। বাড়িয়েছে সাম্রাজ্যের পরিধি। উজ্জ্বল আর নিরাপদ করেছে আমাদের ভবিষ্যৎ। অপেক্ষাকৃত কম বয়সীরা সর্বান্তকরণে সাহায্য করেছে প্রতিটি বিজয়ে। আনুগত্য প্রদর্শন করেছে ইংরেজ সেনাপতিদের প্রতি। অথচ তাদেরই দেওয়া হলো কঠোর সাজা। এমন অমানবিক ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য ছিল আমার কাছে অনভিপ্রেত। আমি চার বছর তাদের কাছে থেকেছি। বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় আমি তাদের কাছে তরুণ। তরুণ মন আমার তাদের দুঃখে ভারাক্রান্ত। আমি স্বস্তি পাচ্ছিনা। এই অনুভিপ্রেত শাস্তি সরল মনে মেনে নেওয়া আমার পক্ষে কঠিন।'

তরুণ অফিসারের মন মেনে নিতে না পারলেও বন্দী সিপাহীরা মেনে নিয়েছিল। প্রবেশ করেছিল জেলে। যখন তাদের চোখে অশ্রু ছিল না। আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। দেশীয় সিপাহীরা তাই প্রতিজ্ঞা করেছিল যে কোন উপায়ে বন্ধুদের মুক্ত করবে। প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে। হত্যা করবে ইংরেজ অফিসারদের। প্রতিশোধ

গ্রহণ করবে নেমকহারামির। পরদিন দুপুর পর্যন্ত ভালোয় ভালো কেটে ছিল। বিকেলে একটা পাচক ছেলে এসে দেশীয় ব্যারাকে খবর দিয়েছিল, কর্নেল স্মীথ শহর থেকে কামার এনে শত শত বেড়ি তৈরি করাচ্ছেন। তোমরা বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করছো বলে গোপন খবর পেয়েছেন স্মীথ সাহেব। তোমাদের সবাইকে রাত্রে হাতে পায়ে বেড়ি পরানো হবে। ঢোকানো হবে জেলে।

ছেলেটা ছিল কর্নেল স্মীথের পাচক। তার কথা বিশ্বাস করলো সিপাহীরা। আর দেরী নয়। আড়মোড়া খেয়ে উঠলো কর্নেল স্মীথের ৩নং অশ্বারোহী সিপাহীরা। সঠিক পরিকল্পনা করার সময় তারা পেলোনো। অন্যান্য রেজিমেন্টের সৈন্যদের সাথেও আলোচনা করতে পারলোনা। অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা ছুটে গেলো জেলখানার দিকে। দেয়াল টপকে জেলে প্রবেশ করে মুক্ত করলো বন্ধুদের। তারপর হাজির হলো প্যারেড গ্রাউন্ডে। খবর পেয়ে ২০নং রেজিমেন্টের কমান্ডার কর্নেল ফিনিস তার পুরো রেজিমেন্ট নিয়ে হাজির হলেন সেখানে। অধীনস্থ সিপাহীদের সাহায্যে দমন করতে চাইলেন ৩নং অশ্বারোহী বিদ্রোহী বাহিনীকে। কিন্তু ২০নং রেজিমেন্টের দেশীয় সিপাহীরা তার আদেশ অমান্য করলো। বিদ্রোহীদের সাথে একাত্ম হলো। রেগে গেলেন কর্নেল ফিনিস। গালাগালি করলেন তার বাহিনীকে। ইতিমধ্যে ১১নং রেজিমেন্টের সৈন্যরাও হাজির হয়েছিল ঘটনাস্থলে। একজন সৈনিক গুলী করলো কর্নেল ফিনিসের বুক লক্ষ্য করে। নিহত হলে কর্নেল ফিনিস। তারপর বেপরোয়া হয়ে সবাই মিলে আক্রমণ করলো ইংরেজ অফিসারদের কলোনী। পুড়িয়ে ছারখার করে দিলো বাড়িগুলো। হত্যা করলো অনেককে। কিন্তু কর্নেল স্মীথের সাক্ষাৎ পেলোনো। তিনি তখন আশ্রয় নিয়েছেন দূরে কোথাও। ভয়ে রাত্রে বাসায় ফিরলেন না তিনি। থাকলেন গোলন্দাজ বাহিনীর প্রহরায় নিরাপদ আশ্রয়ে।

সারারাত বিদ্রোহের তান্ডব দেখিয়ে ভোরের দিকে বিদ্রোহীরা যাত্রা করলো দিল্লী অভিমুখে। রাজধানী দখল করে অশীতিপর বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট ঘোষণা করার বাসনায় তারা একমত হলো। বিদ্রোহী সিপাহীরা দু'ভাগ হয়ে একদল গেলো বেরিলীর দিকে। সেখান থেকে সৈন্য সংখ্যা ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে যাবে দিল্লীতে। অন্যদল গেলো সোজা দিল্লীর পথে।

পরদিন ১২ই মে বিদ্রোহীরা দিল্লী নগরী অবরোধ করেছিল। দিল্লীর নামমাত্র সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তখনো পর্যন্ত বিদ্রোহ সম্বন্ধে কোন খবর রাখতেন না। ইংরেজ কয়েকজন কর্মকর্তা কিছুক্ষণ আগে সংবাদ পেয়েছিলেন। প্রথম সংবাদ পান ফ্রেজার। তিনি সলাপরামর্শ করার জন্য যোগাযোগ করেন স্যার মেডকাফের সাথে। তারা নগরের প্রবেশপথগুলো বন্ধের আদেশ দেন। প্রহরী নিযুক্ত করেন প্রবেশ পথে। বিদ্রোহীরা প্রথমে সাক্ষাৎ করতে চায় বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহের সাথে। সম্রাট তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন। তিনি খবর দেন প্রাসাদরক্ষী প্রধান ক্যাপ্টেন ডগলাসকে। ক্যাপ্টেন ডগলাস আগেই খবর পেয়েছিলেন মীরাটের বিদ্রোহের। তিনি তাই বিদ্রোহী সিপাহীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। ফিরে যেতে বলেন মীরাটে।

সিপাহীরা তার কথায় কান দেয় না। দরজা খুলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ক্যাপ্টেন ডগলাস তখন তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার হুমকি দেন। সিপাহীরাও পাল্‌টা হুমকি দেয় তাকে। সে সময় তারা খবর পায় ফ্রেজার কোলকাতা গেটে রয়েছেন। বিদ্রোহীরা দলবেঁধে যায় সেখানে। জোর করে প্রবেশ করে শহরের অভ্যন্তরে। ক্যাপ্টেন ডগলাসও গিয়েছিলেন সেখানে। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে যান নিজের আস্তানায়। ফ্রেজারকেও আসতে বলেন সাথে। ইতিপূর্বে ফ্রেজার একজন দ্বাররক্ষীকে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন গাফলতির জন্য। বিদ্রোহীরা এতে আরও ক্ষেপে যায়। তারা ধাওয়া করে ফ্রেজারকে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার সময় বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে প্রাণ হারান ফ্রেজার। তারপর বিদ্রোহীরা উপরে উঠে ক্যাপ্টেন ডগলাস, রেভারেন্ড, জেনিংস ও তার মেয়েকে হত্যা করে। ওদিকে স্যার মেড-কাফ বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার জন্য ঘোড়ায় চড়ে খোলা তরবারি হাতে গিয়েছিলেন আজমিরি গেটের দিকে। বিদ্রোহীরা ধাওয়া করে তাকেও। অনেক কষ্টে তিনি শহরের বাইরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। দিল্লী শহরে নিযুক্ত পুরো তিনটি পদাতিক বাহিনী যোগদান করে মীরাট থেকে আগত বিদ্রোহীদের দলে। এই সময় তারা শহরে অবস্থানরত অনেক ইংরেজ কর্মকর্তাকে হত্যা করে। শহরের পূর্ণ কর্তৃত্ব এসে যায় তাদের কব্জায়। থানা, ব্যাঙ্ক, বারুদখানা প্রভৃতি স্থান নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তারাই। গভীর রাতে একুশ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে সম্রাট বাহাদুর শাহকে স্বাধীন ভারতের সম্রাট হিসেবে বরণ করে।

সম্রাট অবশ্য পরদিন সিংহাসনে আরোহন করে আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেন। উচ্ছৃঙ্খলতা পরিহার করতে বলেন দেশগত-প্রাণ সিপাহীদের। আইনের শাসন কায়েম করতে বলেন তাদের। পরিত্যাগ করতে বলেন প্রতিহিংসা। ক্রমান্বয়ে নিযুক্ত করেন কোতোয়াল, প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তা। শান্ত হতে বলেন সবাইকে। স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে চিঠি পাঠান বিশাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কাছে। ইংরেজ রাজত্ব অবসানে একযোগে কাজ করতে বলেন সবাইকে।

মীরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহ দেখা দেয় ভারতবর্ষের সর্বত্র। কানপুর, বেরিলী, অযোধ্যা, বাংলা বিহার প্রভৃতি স্থানের ইংরেজপুষ্ট দেশীয় সিপাহীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিল্লী ইংরেজদের হাত ছাড়া হলেও অন্যান্য স্থানে তারা প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে থাকে। অনেক ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও কৃতকার্য হয়। কেন হয়, কেমন করে হয়, সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

অবশেষে ইংরেজরা পুনরুদ্ধার করে দিল্লী। সে জন্যে তাদের সময় লাগে প্রায় পাঁচ মাস। এসব পুনরুদ্ধার কাজে তারা কী ধরনের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল তা আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু কেন এই বিদ্রোহ ?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় চর্বিমাখা কার্তুজই বুঝি বিদ্রোহের মূল কারণ। আসলে কিন্তু তা নয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। এনফিল্ড রাইফেল

অন্যতম কারণ বটে, তবে একমাত্র কারণ নয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণকে ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

ডাইহৌসীর স্বত্বলোপ-নীতি দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসন এবং সাধারণ অধিবাসীদের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষতিসাধন করেছিল। ভেতরে ভেতরে তাদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল। ছলে বলে কৌশলে ইংরেজদের পররাজ্য দখল ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি কেউই সুনজরে দেখেনি, মেনে নেয়নি স্বাভাবিকভাবে। স্বত্বলোপ-নীতি প্রয়োগে সাতারা, সম্বলপুর, নাগরপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য ইংরেজদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। কানপুরের দত্তকপুত্র নানা সাহেব ও তাঞ্জোর এবং কর্নাটের রাজপরিবারের ওয়াদাবদ্ধ ভাতা বন্ধ করে দেওয়ায় সেখানকার সবাই ছিল ইংরেজদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা। কুশাসনের মিথ্যা অভিযোগে অযোধ্যা অধিকারেও দেশবাসী ছিল অসন্তুষ্ট। মিথ্যা অভিযোগে এসব রাজ্য দখল করা ছাড়াও সেসব রাজপরিবারের সদস্যদের উপর অন্যায় অত্যাচার ও অমানবিক ব্যবহার দেশবাসীকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। নাগপুরের রাজ-বাড়ি ও অযোধ্যার শাহীমহল লুঠ করা হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত শাহী সম্পদ, মণিমুক্তা হীরা, জহরত এমনকি আসবাবপত্র ও হাতিঘোড়া পর্যন্ত তাদের লালসা থেকে রেহাই পায়নি। অযোধ্যার শাহীমহল থেকে সম্ভ্রান্ত বেগম ও শাহজাদীদের জোর করে বহিষ্কার করা হয়েছিল। অপমানিত হয়েছিলেন হেরেমবাসীরা। সে করুণ দৃশ্য অযোধ্যার অধিবাসীরা সহ্য করতে পারেনি। এসব কারণে ভারতবাসীদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, ইংরেজদের সাথে ভালো ব্যবহারের কোন মূল্য নেই। তাদের কোন ওয়াদার দাম তারা নিজেরাই দেয়না। প্রয়োজনবোধে চুক্তি করে, দরকার হলে বিনা কারণে তা ভঙ্গ করে। ওদের লোভ লালসার কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাই দেশীয় রাজা-বাদশাহ জমিদার-মহাজন রাজকর্মচারী সাধারণ মানুষ এবং দেশীয় সিপাহী বরকন্দাজরা ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতি ও তাদের প্রতি আনুগত্য মূল্যহীন বলে ভাবতে থাকেন। ঘৃণা আর বিদ্বেষে তাদের মন বিষিয়ে উঠে। তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। তাছাড়া বৃটিশ কর্মচারীরা দেশবাসীর উপর যে অত্যাচার করতো তা ছিল অসহ্য। জ্যাকসন, গাবিন প্রভৃতি কর্মচারী মানুষের মনে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে দিন গুণছিলো।

সামাজিক কারণও বিদ্রোহের ক্ষেত্রে তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ শাসক-বর্গের ভারতীয়দের প্রতি ঘৃণা এবং তাদের এড়িয়ে চলার মনোবৃত্তি দেশবাসীকে ব্রিটিশ বিদ্বেষী হতে সাহায্য করেছিল। তারা ভারতবাসীকে মানুষ বলে গণ্য করতো না। যখন তখন যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতো। তাদের অধীন কর্মচারীদের প্রতিও ঘৃণা পোষণ করতো। ওয়ারেন্ট হেস্টিংসকে একটা চিঠিতে ইংরেজ কর্মকর্তাদের এই মনোভাব ও ব্যবহারের কথা উল্লেখ করতে দেখা যায়। লেফটেন্যান্ট ভানে ও তার রচনায় এ সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। ভারতবাসীরাও যতদুর সম্ভব ব্রিটিশ কর্মচারীদের এড়িয়ে চলতো ভার্নে বলেছেন,—'পারত-পক্ষে কোন সম্ভ্রান্ত ভারতবাসী ইংরেজ কর্মচারীর সংস্পর্শে

আসতেন না। একান্তই যদি কোন কারণে কাউকে আসতে হতো তবে দ্বিতীয়বার আসার ইচ্ছে তিনি হারিয়ে ফেলতেন। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রতি তার ঘৃণাই জন্মাতো। সত্যিকথা বলতে কি, সেজন্যে ইংরেজ কর্মচারীরাই ছিলো দায়ী।'

অর্থনৈতিক কারণও সিপাহী বিদ্রোহের জন্য কম দায়ী নয়। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ কর্মকর্তারা ভারতবর্ষ থেকে এতো বেশি পরিমাণ সোনারূপ, মণিমানিক্য অর্থসম্পদ বিলেতে পাচার করেছিল যে ভারতীয় অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়েছিল। পরিণতিতে রাজরাজড়া নবাব-বাদশাহ্ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশের রাজনীতি মানুষকে দেউলিয়া করে ফেলেছিল। তাছাড়া বিলেতী শিল্প সম্ভারের বিপুল আমদানী ভারতীয় ক্ষুদ্রশিল্প বিনাস করেছিল। সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষার কদর কমে যাওয়ায় বিপুল সংখ্যক হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তি বেকার হয়ে পড়েন। তাদের জীবিকা অর্জনের পথ প্রায় রুদ্ধ হয়। সে কারণে তারাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন।

যেসব ভারতবাসী ইংরেজ শিবিরে নাম লিখিয়েছিল, যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতো, তাদের অন্তরেও বেদনা কম ছিল না। কর্মকর্তাদের নিকট থেকে ভালো ব্যবহার তো তারা পেতোই না। অধিকন্তু বেতনের তারতম্য তাদেরকে দিন দিন বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাদের মাসিক বেতন দেওয়া হতো নয় টাকা অথচ ইংরেজ সৈনিককে চল্লিশ টাকারও বেশি দেওয়া হতো। দেশীয় সিপাহীদের ইংরেজ বিদ্বেষের মূলে এটাও ছিল একটা বড় কারণ।

পদোন্নতির ব্যাপারে দেশীয় সিপাহীদের যোগ্যতা ও অনুগত্যের কোন মূল্য ছিল না। অভিজ্ঞ দেশীয় সিপাহীদের উপর অফিসার হিসেবে চাপিয়ে দেওয়া হতো অনভিজ্ঞ কম বয়সী ইংরেজদের। তাদের ব্যবহার, সম্বোধনের ভাষা এবং কথায় কথায় শাস্তি, দেশীয় সিপাহীদের মন ভেঙ্গে দিয়েছিল। উদ্বুদ্ধ করেছিল বিদ্রোহ ঘোষণায়। ইংরেজ নিধনে করেছিল বাধ্য।

ধর্মের ব্যাপারটাও কম ছিল না। হিন্দুদের সতীদাহ নিবারণ বিধবা বিবাহ আইন হিন্দুদের এবং সিপাহী ও কয়েকদীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার নীতি মুসলমানদের করেছিল ইংরেজ বিদ্বেষী। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা অস্পৃশ্যজ্ঞান করলেও খ্রীস্ট ধর্ম যাজকরা যখন তাদের খ্রীস্টান বানাচ্ছিল তখন হিন্দুরাও ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

তারপর এসেছিল চর্বিমাখা কার্তুজ। শূকর ও গরুর চর্বি সে কার্তুজে ব্যবহৃত হওয়ায় হিন্দু মুসলিম দেশীয় সিপাহীরা বারুদের মতো ফেটে পড়েছিল। বিদ্রোহ করেছিল বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে। ইংরেজ কর্মকর্তাদের হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল দীর্ঘদিনের বঞ্চনার। দেশ স্বাধীন করে ইংরেজদের নির্মূল করতে চেয়েছিল উপমহাদেশ থেকে। সে সাথে যোগ দিয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলের নিগৃহীত নিপীড়িত রাজা-বাদশাহ, জমিদার মহাজন ও সাধারণ মানুষ। কিন্তু উপযুক্ত নেতা ও সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাব তাদের সফলতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ব্যর্থ করেছিল তাদের জীবনপাত সংগ্রাম।

প্রথমদিকে ইংরেজরা কোনঠাসা হয়েছিল সর্বত্র। কিন্তু পরিকল্পনাহীন যুদ্ধ এবং কতিপয় দেশীয়, বিশেষ করে শিখ সম্প্রদায়ের বিশ্বাসঘাতকতা স্বাধীনতা কর্মীদের ব্যর্থতার দিকে দ্রুত এগিয়ে দিয়েছিল।

এই সময় শিখ সৈন্যরা ইংরেজদের খয়ের খা হবার জন্য দেশীয় সিপাহীদের উপর কেমন হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল তার একটা মাত্র উদাহরণেই বিষয়টা পরিস্কার হবে। অমৃতসরের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপারের জবানবন্দীতেই সে মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনাটা বিবৃত করা যাক। কুপার তার "ক্রাইসিস ইনদি পাঞ্জাব" গ্রন্থে লিখেছেনঃ

'মীরাট সেনানিবাসের বিদ্রোহের খবর পাঞ্জাব মীয়ামীরের ২৬নং ইনফ্যান্ট্রির দেশীয় সিপাহীদের চঞ্চল করে তোলে। দিল্লী শহর পতনের খবর হয়তো গোপনে তারা পেয়ে থাকবে। মীয়ামীরের ইংরেজ কর্মকর্তারা সাবধান হতে চান। অনেক সলাপরামর্শের পর দেশীয় সিপাহীদের নিরস্ত্র করার পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করেন।

১৮৫৭ সালের ১৩ই মে বিনামেঘে বজ্রপাত হলো। দেশীয় সিপাহীদের স্বাভাবিক রুটিন মাফিক প্যারেড বন্ধ করে সবাইকে হাতের অস্ত্র মাটিতে রাখতে বলা হলো। তারপর শিখ সিপাহীদের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হলো সেসব আগ্নেয়াস্ত্র। সন্দেহজনক বিপুল সংখ্যক দেশীয় সিপাহীকে চলে যেতে বলা হলো ব্যারাকে। তাদের প্রহরায় নিযুক্ত রইলো শিখ সিপাহীরা। এতে শত শত দেশাগতপ্রাণ সৈনিক নিজেদের অপদস্ত মনে করলো। সরকারী আদেশ শান্তশিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈনিকের মতো পালন করলেও নিরস্ত্র সিপাহীরা ভেতরে ভেতরে জ্বলতে লাগলো। স্বাধীনতার হীনতা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো। অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো শিখ সৈন্যদের প্রতি। বিনা কারণে এভাবে লাঞ্ছিত হওয়ায় তারা ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে দিনাতিপাত করার চাইতে মুক্তির পথ খুঁজলো। কিন্তু শিখ সৈন্যরা তাদের সে পথ বন্ধ করে রেখেছিল। এই অনভিপ্রেত অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মানসিকতাও তারা হয়তো হারিয়ে ফেলেছিল।

বন্দী জীবন যাপন করতে লাগলো নিরস্ত্র সিপাহীরা! কোনো কাজ নেই। সৈনিক জীবনের যেটা বড় সম্পদ সেই হাতিয়ার নেই। ছুটি নেই। কারো মারাত্মক অসুখের খবরেও বাড়ীতে যাবার অনুমতি নেই। কর্মহীন, দায়িত্বহীন, বহিবিশ্ব থেকে সম্পর্কহীন নিরবচ্ছিন্ন, অলস দিনগুলো কোনো রকমে গড়িয়ে চলতো লাগলো। কঠোর কর্মী কর্তব্যনিষ্ঠ লোকগুলো নিষ্প্রাণ জীবের মতো কাটালো আড়াই টা মাস। এরপর অবস্থার যখন কোনো উন্নতি দেখা গেলো না, তাদের সাথে ক্রমান্বয়ে অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের মাত্রা বাড়তে লাগলো তখন তারা সকল আশা ছেড়ে দিলো। বদ্ধ পিঞ্জর থেকে একযোগে মুক্তির সুযোগের অপেক্ষায় অধীর হয়ে পড়লো।

৩০শে জুলাই সেই ইপ্সিত সুযোগ এসে গেলো।

হঠাৎ সেদিন পাঞ্জাবের বিখ্যাত ধূলোঝড় বিপুল বেগে ধেয়ে এলো মীয়ামীরের সেনানিবাস এলাকায়। প্রচন্ড বেগে আঘাত হানলো সেনানিবাসের তাবু রাজ্যে। লন্ডভন্ড হয়ে গেলো সৈনিক জীবনের বড় সম্পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিব্যবস্থা। শুকনো ধুলো আচ্ছন্ন

করলো সমগ্র এলাকা। চোখে মুখে আঘাত করলো চাবুকের মতো। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সবাই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগলো। বিশৃঙ্খলা সর্বত্র।

নিরস্ত্র অপমানিত দেশীয় সিপাহীরা এটাকে মনে করলো মোক্ষম সুযোগ। ২৬নং ইনফ্যান্ট্রির সকল সৈন্য শূন্য হাতে ঘুচিয়ে দিলো বন্দী জীবন। শৃঙ্খলহীনতার সুযোগে দলে দলে বেরিয়ে পড়লো অন্ধকারাচ্ছন্ন ধূলোঝড়ের মধ্যে। তারা মুক্তির আশায় বেরিয়েছিল, না ঝড়ের কবল থেকে পরিত্রাণের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল তা আজ নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল। কারণ সুদীর্ঘ আড়াইটা মাসের মধ্যে তাদেরকে কখনও এমনটি করতে দেখা যায়নি। কিছু কিছু সিপাহী যদি ঝড়ে সুযোগ নেবার মনস্থ করে থাকে তবে সবাই যে, সে দলে ছিল তা জোর করে বলা যায় না। কারণ, ঝড়ের পূর্বোভাস তারা জানতো না। সলাপরামর্শ করার সুযোগও তাদের ছিল না। একযোগে এতবড় একটা কাজের ঝুঁকি নিতে হলে অন্ততঃ একটা সারধারণ কর্মসূচী প্রয়োজন। যেহেতু সে সুযোগ তাদের ছিল না, সেহেতু মনে হয় সবাই একযোগে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করেছিল অনেকে। অনেকে হয়তো অন্যের দেখাদেখি বেরিয়ে পড়েছিল। সুশৃঙ্খল ছিল না তারা। হয়তো কর্মপন্থাও ছিল না একই রকম।

শিখ সৈন্যরা কিন্তু ভুল করলো, মারাত্মক অন্যায় করলো। তারা বেধড়ক গুলী চালালো ২৬নং ইনফ্যান্ট্রির নিরস্ত্র হতাশাগ্রস্ত বিশৃঙ্খল দেশীয় সিপাহীদের উপর। অন্ধকারে যদিও কিছুই মালুম করা যাচ্ছিল না, তবু আবছা আলোয় নিশানা করে গুলী ছুড়তে তাদের অসুবিধা হয়নি। তীরবিদ্ধ পাখির মতো অনেকেই আহত হয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। অন্যরা জীবন নিয়ে পালাতে হলো তৎপর। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যেভাবে শিখ সৈন্যরা গুলি ছুড়ছে তাতে শিবিরের মধ্যে থাকা মানে গুলীতে প্রাণ হারানো অথবা পরদিন ফাঁসির দড়িতে ঝোলা। কোনটাই অভিপ্রেত নয়। তাই হয়তো প্রাণপনে ছুটেছিল সবাই ফটকের দিকে।

গোলাগুলীর শব্দে মেজর স্পেমার এবং সার্জেন্ট মেজর বেরিয়ে এসেছিলেন। বাধা দিয়েছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত পলায়নপর সিপাহীদের। তারা উভয় নিহত হলেন দেশীয় সৈন্যদের হাতে। কারো কারো হাতে হালকা ছোরা ছিল। এরপর তারা সত্যিই বেপরোয়া হলো। ছুটে গেলো শিবিরের বাইরে। প্রাণে বাঁচার জন্য তারা ছুটে গেলো ইরাবতী নদীর দিকে। ভেবেছিল, কোনো প্রকারে নদীটা পার হতে পারলেই তারা নিরাপদ। অভুক্ত লোকগুলো নদীর তীরে এসে পড়লো মহাসমস্যায়। ঘাটে একটিও নৌকা নেই। কী করে খরস্রোতা নদী অতিক্রম করবে ?

খবর পৌঁছলো আমার কানে। আমি ব্যস্ততার মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। আশিজন সশস্ত্র ব্যক্তিকে নিয়ে ধাওয়া করলাম তাদের। দিল্লীর খবর আমার জানা ছিল। ওদের বন্দী করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

ওদিকে উজনালা থেকে দারোগা এসেছিল আরেকদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে। তারা আক্রমণ চালিয়েছিল নদীরে তীরের অপেক্ষামান অসংখ্য নিরস্ত্র পলাতক সিপাহীদের

উপর। তাদের গুলীতে দেড়শতের মতো সিপাহী নিহত হয়েছিল। তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল ইরাবতীর বেলাভূমি। অবশিষ্টরা প্রাণের মায়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল খরস্রোতা নদীর বুকে। নদীর মাঝামাঝি একটা দ্বীপ ছিল। সেখানে হয়তো আশ্রয় নিতে চেয়েছিল তাড়া খাওয়া নিরীহ লোকগুলো। কিন্তু সবাই সেখানে উঠতে পারেনি। অনেকেই ডুবে মারা গিয়েছিল নদীতে। যারা দ্বীপে উঠেছিল তারাও শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারেনি। ইতিমধ্যে আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম অকুস্থলে। আমার সঙ্গী শিখ সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কয়েকটা নৌকা সংগ্রহ করে আনলো। আমাকেসহ ভাসিয়ে দিলো নদীতে। দেশীর ভাইদের হত্যা করার জন্য তখন তারা বেপরোয়া। আমরা গিয়ে যখন সেই আশ্রয়কারীদের আক্রমণ করলাম তখন তারা আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো নদীতে। জলচর পাখিরা যেমন করে সাঁতার কাটে, ওরাও তেমনি প্রাণের মায়ায় ইরাবতীর বুকে সাঁতরাতে লাগলো। শিখ সৈন্যরা তাদের মাথা লক্ষ্য করে গুলী চালালো। আমি তাদের বাধা দিলাম। এমনি করে মারতে নিষেধ করলাম। বললাম,—'মেরো না। ধরার চেষ্টা করো। যাবে কোথায় ? আর লোকগুলোর উদ্দেশ্য চিৎকার করে বললাম,—পালাতে পারবে না, তোমরা ধরা দাও।

লোকগুলো হয়তো আমাকে বিশ্বাস করলো। ভাবলো, ডিপুটি কমিশনার সাহেব হয়তো ভালো ব্যবহার করবেন। তাই তারা আত্মসমর্পন করলো। শিখ সিপাহীরা সহজে পাকড়াও করতে পারলো তাদের। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকেই সলিল সমাধি হয়েছে।

বিদ্রোহী লোকগুলোকে বন্দী করা হলো। গ্রাম থেকে দড়ি যোগাড় করে হাত বাঁধা হলো প্রত্যেকের। কেউ প্রতিবাদ করলো না। ভাবলো, অন্যায়ভাবে তাদের মারা হবে না। বিচার করা হবে সামরিক আদালতে। তখন তারা কৈফিয়ত দেওয়ার সুযোগ পাবে। বাঁচতে পারবে জীবনে। ফিরে পাবে সৈনিক জীবন। অথবা ফিরে যেতে পারবে নিজ নিজ সংসারে। তার আগে তাদের খেতে দেওয়া হবে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। তারা তখন ছিল উপবাসী ক্ষুধার্ত।

শেষাবধি দুইশত বিরাশিজন বন্দীকে আনা গেল উজনালার থানায়। তখন রাত গভীর। একটা বন্ধ ঘরে কড়া প্রহরায় রাখা হলো তাদের। বিচার শালিস না করে পরদিনই সবাইকে খতম করার দাবী জানালো আমার অনুগামী সৈন্যরা। আমিও তাদের সাথে একমত হলাম। বিচারের ঝামেলায় যেতে চাইলাম না। ভারতবর্ষের চারদিকে বিদ্রোহের ঝড় উঠেছে। দিল্লী তখন আমাদের কর্তৃত্বের বাইরে। সেখানে স্বাধীন সরকার কায়েম করেছে বিদ্রোহী সৈন্যরা। দিল্লীতে এবং অন্যান্য স্থানে তারা হত্যা করেছে অগণিত ইংরেজ নরনারীকে। এরাও মেরেছে মীয়ারের দু'জন পদস্থ অফিসারকে। নতুন করে বিচার-শালিস সাক্ষ্য-প্রমাণের কী দরকার ? খতম করাই উত্তম।

কিন্তু বিধিবাম। পরদিন ভোর থেকেই শুরু হলো অবিরাম ধারায় বর্ষণ। এতোগুলো লোককে হত্যা করা জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। ঠাণ্ডা লাগাতে ইচ্ছা হলো না। ছোট্ট ঘরে সারাদিন মানবেতার পন্থায় আবদ্ধ রাখা হলো লোকগুলোকে। বিশ্রাম নিলাম আমরা। অমানুষিক পরিশ্রম শেষে বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পরদিন আকাশ পরিস্কার হলো। শিখ সৈন্যদের প্রয়োজনীয় দড়ি যোগাড় করতে বলেছিলাম। তারা বিস্তর দড়ি নিয়ে এসেছিল পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলো থেকে। কিন্তু মুশকিল হলো উজনালায় বড় গাছের সংখ্যা বেশি ছিল না। ফাঁসি দেওয়ার সমস্যা দেখা দিলো। তাই ঠিক হলো প্রতিবারে দশজন করে বিদ্রোহীকে এক দড়িতে বেঁধে নেওয়া হবে বদ্ধভূমিতে। গুলী করেই হত্যা করা হবে তাদের এক সাথে। স্বতস্ফূর্ত ভাবে গুলি করার দায়িত্ব নিলো কয়েকজন শিখ সিপাহী। আমার জন্য সুবিধা হলো। পুলিশেরা মানুষ মারায় তখনো ওস্তাদ হয়ে ওঠেনি। বন্দী সিপাহীরা তখনো কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত জানতে পারেনি। তারা বাঁচার আশায় মুহূর্ত গুণছিলো। যখন শিখ সেন্যরা তাদের পরিণতির কথা জানালো, তখনই তাঁরা সত্যিকার বিদ্রোহের রূপ ধারণ করলো। শিখদের বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান আর দেশদ্রোহী বলে গালিগালাজ করলো। কিন্তু তাতে আমাদের কিছুই এসে গেলো না। পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিলাম।

বিদ্রোহী সৈন্যদের উপর গুলী চালানোর জন্য যাদের বাছাই করা হয়েছিল সেসব শিখ সৈন্যরা বদ্ধভূমি তৈরি করে আমাদের খবর পাঠালো। আমরা প্রতিবারে দশজনকে একদড়িতে বেঁধে পাঠাতে লাগলাম। এই সময় কিংবা বিদ্রোহীদের বন্দী করার সময় যদি শিখ সৈন্যরা বেঁকে বসতো, যদি আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো, তবে মরা ছাড়া আমাদের কোনো পথ ছিল না। সংখ্যায় আমরা ছিলাম নগণ্য। বিদ্রোহী ও অনুগত শিখ মিলে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তেমন কিছু হয়নি। সর্বত্রই শিখ সৈন্যরা আমাদের প্রতি সবসময় ছিল অতিশয় অনুগত। তাদের উপর বিশ্বাস না করার কারণ সমগ্র সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালে কোথাও ঘটেনি। তাই প্রথম থেকেই নিরাপত্তা বোধ করেছিলাম আমরা।

আমি থানায় বসে আসামীদের বদ্ধভূমিতে নেওয়া ও সুচারুরূপে সবকিছু সম্পন্ন হওয়ার তদারক করছিলাম। নিষ্ঠার সাথে কাজ করছিল শিখ সৈন্যরা। আমরা, বিদোশীরা বদ্ধঘরে কিংবা বদ্ধভূমিতে যাবার প্রয়োজন বোধ করিনি। সবকিছু ভালোয় ভালোয় চলছিলো। তবে দশজন করে বন্দীকে যখন আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তারা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। দেশীয় ভাষায় গালিগালাজ করছিল শিখ সিপাহীদের। মনে হচ্ছিল ছাড়া পেলে শিখদের তারা চিবিয়ে খাবে।

পনেরোটা দলকে এভাবে নেওয়া হলো। হত্যা করা হলো একশ পঞ্চাশজন বিদ্রোহী সিপাহীকে। এরপর ঘটলো একটা অঘটন। এতো লোককে মারাতো দূরের কথা, এতো গুলো মৃত লাশই হয়তো একজন গুলি নিক্ষেপকারী আগে দেখেনি। ফলে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। পড়ে গেলো মাটিতে। খবর এলো আমার কাছে। বন্ধ রাখতে বললাম হত্যাযজ্ঞ। শুশ্রুষা করতে বললাম মূর্ছিত ঘাতককে। বিশ্রাম গ্রহণ করতে বললাম অন্যদের। আবার আরম্ভ হলো একই নাটকীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দু'শত সাইত্রিশজনকে হত্যা করার পর একজন কর্মচারী আমাকে জানালো, বন্দীখানা থেকে আর কেউ বাইরে আসতে চাচ্ছে না। ওরা হয়তো জেদ করে বসে আছে।

এতক্ষণ হাজত ঘরে কেউ ঢোকেনি। ডাকার পর বাইরে এলে দশজনকে নিয়ে ওরা বদ্ধভূমিতে যাচ্ছিল। ছোট্টঘরে অতোগুলো লোক গাদাগাদি করে দু'দিন থাকায় নোংরা দুর্গন্ধময় হয়েছিল ঘরটা। তাই ভেতরে ঢুকতে চায়নি শিখ সৈন্যরা। তার প্রয়োজনও হয়নি এতোক্ষণ। ডাকলেই বেরিয়ে এসেছিল একে একে। এতোগুলো লোক মরার পর তাদের নতুন করে জেদ করার মানে হয় না। আপত্তি জানাতে চাইলে তারা প্রথমেই করতে পারতো। তখন সংখ্যায় বেশি ছিল। অবাক হলাম আমি। ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখার জন্য নিজেই গেলাম সেখানে। বাইরে আসার জন্য বন্দীদের অনুরোধ করলাম। কোনো ফল হলো না। কেউ সাড়া দিলো না। পালন করলো না আমার নির্দেশ। বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেলো। দরজা দিয়ে মুখ গলালাম ভেতরে। দেখলাম, এক অভাবনীয় কান্ড। পঁয়তাল্লীশজন বিদ্রোহী বন্দীর মৃতদেহ পড়ে আছে নোংরা মেঝেতে। ভয়ে, শ্রান্তিতে অথবা শাসকষ্টে প্রাণ হারিয়েছে তারা। ওদের জন্য গুলী খরচ করতে হলো না আমাদের।

মুর্দাকাফারাসকে লাশগুলো বের করতে বললাম। পরিস্কার করতে বললাম ঘরটা। তারপর থানার একশ গজ দূরে যে কুয়াটা ছিল তার মধ্যে ফেলতে বললাম লাশগুলো। এভাবে মীয়ামীরের বিদ্রোহীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলো। শিখ সিপাহীদের সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না।'

ইংরেজরা অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যা বানোয়াট গল্প প্রচার করেছিলো দেশ বিদেশে, নিজেদের দোষ ঢেকে রাখার জন্য কিংবা অনাচারের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য সেটা হয়তো করেছিলো তারা। কিন্তু উজনালার নৃশংসতা কাল্পনিক অন্ধকূপ হত্যার বিভীষিকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, অথচ ইংরেজরা নির্মমতার হৃদয়হীনতার এমন অমানবিক কাহিনী স্বেচ্ছায় প্রচার করেছিল কেন ? সেটা কি সত্য প্রকাশের খাতিরে ?

না, কখনো না, এটাকে তার পরম কৃতিত্বের, একটা বিশেষ গৌরবের কাজ বলে মনে করেছিলেন। প্রচার করেছিলেন তাই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে। অবাক কান্ড, তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেজন্য তাকে বীরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। চীফ কমিশনার স্যার জন লরেন্স এবং গভর্ণর জেনারেল তাকে উচ্ছসিত প্রশংসা করে বিশেষ পত্র দিয়েছিলেন। প্রধান বিচারপতিও বাদ যাননি। তিনি কফারক পাঠিয়েছিলেন একটা বিশেষ প্রশংসাপত্র। বলেছিলেন,—'আপনার মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই জয়টীকা আপনার মাথায় শোভা পাবে।'

যাদের নিয়ে এতো কান্ডকারখানা তারা কী করেছিল ? বিনা কারণে অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার অলস জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছিল। নৃশংসতার শিকার হবার আগে জীবনে বাঁচতে চেয়েছিল। বাধা পেয়ে হত্যা করেছিল দু'জন ইংরেজ কর্মচারীকে। তার জন্য এতো ? সেটা নিয়ে আবার গর্ব ?

ছয়

দিল্লী পুনর্দখলের পর ইংরেজরা একটা সামরিক আদলত গঠন করে বিচার প্রহসনের মাধ্যমে বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে দীপান্তরে প্রেরণ করেছিলো। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের নামে তারা বিনা অপরাধে এ দেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিলো। বিনষ্ট করেছিলো কোটি কোটি টাকার সম্পদ। দীপান্তরের নামে প্রেরণ করেছিলো নির্জন আন্দামান দীপপুঞ্জে শত শত দেশপ্রেমিককে। পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ সে সব লোমহর্ষক হত্যা, ভয়াবহ রাহাজানি, আর নজীরবিহীন উৎপীড়নের খবর জানতে পেরে শিউরে উঠেছিলো। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল পৃথিবীব্যাপী। ফলে বিশ্বের জাগ্রত মানুষের চোখে ধূলো দেবার অসৎ উদ্দেশ্য ইংরেজ সরকার চার পাঁচ বছর আগে সংঘটিত দিল্লী শহরে ফ্রেজার, ডগলাস, জেনিংস, তার মেয়ে ও আরো কিছু ইংরেজ নর-নারীর হত্যাকে কেন্দ্র করে বিচার প্রহসনের ব্যবস্থা করেছিলো। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেদিন তারা কয়েকজন অখ্যাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের দাবী করেছিলো, এমন মনে করা যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো দ্বিবিধ।

ক্ষমতা পুনর্দখলের পর ক্ষিপ্ত ইংরেজ বাহিনীর লোকেরা এদেশের লক্ষ লক্ষ যুবক-বৃদ্ধ, নারী-শিশু, জমিদার-মহাজন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ব্যক্তিকে বিনা বিচারে নির্মমভাবে পথে-ঘাটে, বাজারে-গঞ্জে, শেয়াল কুকুরের মতো হত্যা করেছিলো। সে পাপ ও অপরাধকে গোপন করা এবং সেদিক থেকে বিশ্বের জাগ্রত মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেওয়াই ছিলো তাদের আসল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় কারণটি ছিল আরো সুদূরপ্রসারী। ঐতিহাসিক আজাদী সংগ্রামে (সিপাহী বিদ্রোহে) ইংরেজ সরকার স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে হিন্দু মুসলিম দুটো সম্প্রদায়কে পৃথক করতে না পারলে উপমহাদেশ শাসন করা সম্ভব নয়। দুটো প্রধান সম্প্রদয়কে পরষ্পরের বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে শত্রুতে পরিণত করতে হবে। একটা সম্প্রদায়কে হাতে রেখে বেশি সুযোগ দিয়ে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার। অন্য সম্প্রদায়কে হীন-দুর্বল ও দরিদ্র জাতিতে পরিণত করা প্রয়োজন। তা না হলে আবার তারা একতাবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কারণ, সুলতানী এবং মোগল শাসনকালে হিন্দু-মুসলমান এতো হৃদ্যতার মধ্যে বসবাস করে এসেছে যে, উস্কানী দিয়ে শত্রুতে পরিণত করা অল্প সময়ে সম্ভব নয়। তাই গ্রহণ করতে হবে এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। প্রথম দিকে বাছাই করতে হবে সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিদের। কার্যোদ্ধার করতে

হবে তাদেরই সাহায্য। কাউকে বুঝতে দেওয়া যাবে না সত্যিকার উদ্দেশ্য। কিছুদিন পরে নিগৃহীত জাতি যখন বুঝতে পারবে যে, বিচার প্রহসনের নামে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে মুসলমানদের এবং সাক্ষী হিসেবে খাড়া করা হচ্ছে হিন্দুদের। জমিদারী থেকে নানা অজুহাতে উচ্ছেদ করা হচ্ছে মুসলমানদের এবং বিশেষ পক্ষ-পাতিত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে হিন্দুদের, তখন মুসলমানেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না হিন্দুদের। হিন্দুরা রাজভক্ত হওয়ার জন্যে অবহেলা করবে মুসলমানদের। ফলে নির্ঝঞ্ঝাটে দেশ শাসন করা সম্ভব হবে।

বাস্তবেও হয়েছিল তাই। দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সার্থকভাবে তারা মনোমালিন্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল যে, সুদীর্ঘ একশ বছরেও এই দুই সম্প্রদায় একে অন্যকে বিশ্বাস করতে পারেনি। পাশাপাশি বাস করেও ভাবতে পারেনি প্রতিবেশী, হিতাকাঙ্খী। ফলে বিস্তর ত্যাগ, তিতীক্ষা ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে ভারতবাসী ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলেও একদেশ এক সরকার ও এক আইনের অধীনে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়নি। দেশটাকে দুটো অংশে বিভক্ত করে বানিয়েছিল দুটো দেশ। স্বাধীনতা লাভের পরও তারা রয়ে গেছে পরস্পরের শত্রু। তিন দশকের মধ্যে লিপ্ত হয়েছে তিন তিনটা যুদ্ধে। দেশ গঠনের চেয়ে সমরসম্ভারে ও রণসজ্জায় নিয়োজিত করেছে জাতীয় আয়ের সিংহ ভাগ। সমৃদ্ধশালী উপমহাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরে রয়ে গেছে গরীব, পরমুখাপেক্ষী। নিজের পায়ে কেউ আজও দাঁড়াতে পারেনি। পরাশক্তিগুলো দাঁড়াতে দেয়নি।

সেদিন যে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং মুসলমানদেরকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগালো হয়েছিল তাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ প্রভাবশালী হিন্দু নেতাদের শায়েস্তার জন্যেও ইংরেজরা সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিল কয়েকজন হিন্দু বেঈমানকে। তেমনি মুসলমানকে পেরেছিল মুসলমানের বিরুদ্ধে।

গোয়ালিয়রের বিশিষ্ট জমিদার মানসিংহ ইংরেজ ক্যাপ্টেন মিয়ডের প্ররোচণার কেমন বিশ্বস্ততার সাথে ভারতের সর্বনাশ করেছিলেন তা জানতে পারলে ঘৃণা আর লজ্জায় মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে। সামান্য পার্থিব স্বার্থের জন্যে তিনি তাঁতিয়া তোপীর মতো মহান ব্যক্তিকেও ধরিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

পৃথিবীর আদিকাল থেকে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যারা দেশের ও জাতির সেবা করেছেন তাঁদের সংখ্যা কম হলেও তাঁরা অমর হয়ে আছেন। মানুষ স্থান-কাল জাতি ভুলে তাঁদেরই স্মরণ করে। তবু স্বার্থপরতা আর ত্যাগ যখন পাশাপাশি এসে দাঁড়ায় তখন দেখা যায় স্বার্থপরদের শক্তিই বেশি। তাদের হাতে, তাদের বেঈমানীর কাছে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হন স্বার্থত্যাগী মহা-পুরুষগণ। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসেও অভাব নেই এমন কালো অধ্যায়ের।

দেশের মানুষ যদি ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভুলে যেতো কিংবা সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতো তবে পৃথিবীতে অনেক আগেই শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে

উঠতো। এক জাতি অপর জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। পরদেশ দখল করে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব হতো না। বেঈমানীর দিক থেকে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলো অগ্রগামী ছিল বলেই বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশ এসব দেশে সহজ হয়েছিল, সম্ভব হয়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দীর উৎপীড়ন আর শোষণেই রাজত্ব কায়েম রাখা।

পক্ষান্তরে আবার যখন স্বার্থত্যাগী মানুষ জেগে উঠেছেন, তাঁদের অমিততেজের প্রভাব দেশের অধিবাসীদের উপর বিস্তার লাভ করেছে, তখন সে দেশ ফিরে পেয়েছে স্বাধীনতা। সে জাতি মাথা উচুঁ করে বুকে ফুলিয়ে জাতিসঙ্ঘে লাভ করেছে সন্মানিত আসন। আগের দিনের প্রভুরাই বাড়িয়েছে বন্ধুত্বের হাত। শত্রুতা গেছে ভুলে।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যদি আত্মস্বার্থকে বড় করে না দেখে দেশ উদ্ধারে একতাবদ্ধ হতে পারতেন, পারতেন দরিদ্র সিপাহীদের মতো আত্মবিশ্বাসী হতে, তা হলে আজাদীর জন্য আমাদের আরও একশত বছর সংগ্রাম করতে হতো না। করতো হতো না অপেক্ষা। ১৮৫৭ সালেই আমরা লাভ করতাম আকাঙ্খিত স্বাধীনতা। সে সময়ই পাততাড়ি গুটিয়ে ইংরেজদের পাড়ি জমাতে হতো সাত সাগরের অপর পারে।

যা বলছিলাম, গোয়ালিয়রের জমিদার মানসিংহ চরম বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে সেদিন তাঁতিয়া তোপীর মতো আদর্শ দেশপ্রেমিক ও আপোষহীন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ইংরেজদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলো।

তাঁতিয়া তোপী ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের পুত্রের মুন্সি। তাঁর পিতা ছিলেন বাজীরাওয়ের বিশ্বস্ত সহকর্মী। নানা সাহেব যখন অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে নতুন করে তৎপর, হাজার হাজার দেশপ্রেমিক যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত, তখন তাঁতিয়া তোপীও যোগদান করেন সে দলে। গ্রহণ করেন বিদ্রোহী সেনাদলের নেতৃত্ব। নানা সাহেবের ভুলের জন্যে আগেই কানপুর বেদখল হয়েছিল। প্রথম পরাজয়ের পর ইংরেজরা পুনর্দখল করেছিল কানপুর।

নানা সাহেবের সেনাবাহিনী তখন বিপর্যস্ত। বিশৃংখল। সঠিক নেতৃত্বের সন্ধ্যানে ব্যাপৃত। তাঁতিয়া তোপী তাঁকে চাঙা করার জন্য বললেন,—'আপনি ঘাবড়াবেন না। বিদেশী ইংরেজদের আমরা পরাজিত করবই। নিরীহ কানপুরবাসীদের উপর তারা যে অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আবার দখলে আনতে হবে কানপুর, নিঃশেষ করতে হবে ইংরেজ বাহিনী।'

নানা সাহেব হতাশার স্বরে বললেন,—'গোলা-বারুদ, সৈন্য-সামন্ত কোথায় ? শত্রুদের বর্তমান যে শক্তি তাতে আরো সৈন্য দরকার।' তাঁতিয়া তোপী বললেন,—'ঘাবড়াবেন না। খবর এসেছে গোয়ালিয়রের অধিবাসীরা বিদ্রোহের জন্য তৈরি হয়ে রয়েছে। মানসিংকে গোয়ালিয়রের জমিদারী থেকে উচ্ছেদের ফলে সেখানকার লোকেরা খুব অসন্তুষ্ট। মানসিংহ নিজেও কিছু করতে চাচ্ছেন।'

নানা সাহেব তাঁর সাথে একমত হলেন না। বাধ্য হয়ে দলবল নিয়ে একাকীই চললেন তাঁতিয়া তোপী গোয়ালিয়রে। ধরলেন ছদ্মবেশ। ধরে পড়তে চান না তিনি শত্রু-নিযুক্ত গোয়েন্দা বাহিনীর হাতে। তাদের জানতে দিতে চান না তার কর্মপন্থা এবং গতিবিধি।

গোয়ালিয়রের বিপ্লবীরা তাঁকে চিনতে ভুল করলো না। মেনে নিলো তাঁর নেতৃত্ব। প্রথম আক্রমণ করলেন তিনি কল্পি শহর। সহজেই অধিকার করলেন শহরটি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কল্পি অধিকারে রাখা সম্ভব হলো না। ইংরেজরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করলো। বাধ্য হয়ে তাঁতিয়া তোপী দলবল নিয়ে সরে দাঁড়ালেন কল্পি থেকে। তাঁর সৈন্য বাহিনী আধুনিক যুদ্ধ শিক্ষায় তখনো পারদর্শী হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি নিজেও কখনো সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। যুদ্ধকৌশল তার ছিল অজানা। কিন্তু অন্তরে ছিল অসীম সাহস। হৃদয় ছিল স্বাধীনতা-স্পৃহায় ভরপুর। ১৮৫৮ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে আবার মোকাবেলা করলেন তিনি ইংরেজদের। এবার জয়লাভও করলেন সহজে। পরাজিত হলো ইংরেজরা। সাহস বেড়ে তাঁর সেনাবাহিনীর।

ইংরেজরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেও হাল ছাড়লো না একেবারে। কিছুদিন পরে আবার আক্রমণ করলো কল্পি। এবার টিকতে পারলেন না তাঁতিয়া তোপী। গা ঢাকা দিয়ে সরে গেলেন তিনি আলীপুরে। আস্তানা গাড়লেন সেখানে।

ওদিকে দিল্লীর পতন হয়েছিল আগেই। ইংরেজদের শক্তি ও সাহস বেড়ে গিয়েছিল তাতে অনেকগুণ। তারা নতুন নতুন ফৌজ আর ভারী ভারী কামান বন্দুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো আলীপুরে। পরাজয়ের মুখে তাঁতিয়া তোপী সরে গেলেন জয়পুরের দিকে। তার আগেই জয়পুর এসেছিল ইংরেজ সেনাদের দখলে। বাধ্য হয়ে তিনি যাত্রা করলেন টংকের উদ্দেশ্য। সেখানকার নবাবের সহযোগিতা আশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু চারদিকের অবস্থা বেগতিক দেখে নবাব বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন ইংরেজদের। নিজের জমিদারী ও মানসন্মান বজায় রাখার জন্যে করেছিলেন তিনি সংগ্রামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। তাই তাঁতিয়া তোপীর আগমন সংবাদ জানতে পেরে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন, তাঁতিয়া তার এলাকায় প্রবেশ করতে পারলে ইংরেজরা শাস্তি দেবে তাকেই। তাই তাঁর নিজস্ব বাহিনীকে পাঠালেন তাঁতিয়াকে বাধা দিতে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। নবাবের সৈন্য বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রসহ যোগদান করলো তাঁতিয়ার দলে। তারাও ওয়াদা করলো স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে। তাদের নবাবের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার চাইতে তারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দিলো বেশি।

তাঁতিয়া খুশি হলেন। টংকে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। শতাধিক মাইল ঘুরে হাজির হলেন তিনি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গা কাকরৌলীতে। আরাবল্লী পাহাড় বেষ্ঠিত স্থান। মনে করলেন সেখানে বিশ্রাম নেবেন কিছুদিন। পরিশ্রান্ত দেহ তখন বিশ্রাম চাচ্ছে। ছোটাছুটি আর যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে কেটেছে কয়েক মাস। তিনি বেশ ক্লান্ত।

বিশ্রাম তার ভাগ্যে ছিল না। বিশ্বাসঘাতকরা খবর দিলো ইংরেজ শিবিরে। ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট, জোমস, মেয়েভ প্রমুখরা খ্যাপার মতো এতোদিন তাড়া করে ফিরেছেন তাঁতিয়া তোপীকে। পরিশ্রান্ত তারাও। তাঁতিয়াকে বন্দী না করা পর্যন্ত তাদের স্বস্তি নেই। নেই বিশ্রাম। খবর পেয়ে তাই ছুটলো তারা আরাবল্লী পাহাড়ী এলাকায়। গভীর রাতে গোপনে ঘিরে ফেললো সমগ্র এলাকা। তাঁতিয়া টের পেয়ে গোলা নিক্ষেপ করলেন ইংরেজ বাহিনীকে লক্ষ্য করে। গোলাগুলী চললো দু'পক্ষের। তাঁতিয়ার কাছে ছিল

হালকা কামান। তিষ্ঠাতে পারলেন না তিনি বেশিক্ষণ। ইংরেজদের ভারী কামানের মুখে এক সময় স্তব্ধ হলো তার কামান। থেমে গেল তাঁতিয়ার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ। ইংরেজ সেনাপতি বুঝলেন তাঁতিয়ার রসদ শেষ। নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন তিনি তাঁতিয়ার তাবুরে কাছে। কিন্তু হা-হতস্মি। কোথায় তাঁতিয়া ? চিড়িয়া খাঁচা ছাড়া।

কোন ফাঁকে তাঁতিয়া সরে গিয়েছেন আরো দূরে। গভীর অরণ্যে, নিরাপদ স্থানে। ভারতীয় গোয়েন্দার সাহায্যে ইংরেজ ক্যাপ্টেন সন্ধান পেলেন সে স্থানেও। এবার আরও সাবধান হয়ে তিনি আক্রমণ করলেন তাঁতিয়া তোপীর বাহিনীকে। তাঁতিয়া প্রতিরোধ করলেন এবারও। গোলা বিনিময় হলো কয়েক ঘন্টা। তারপর আবার নিস্তব্ধ। ইংরেজ সৈন্যরা এবার বেশি সতর্কতার সাথে এগুলো তাঁতিয়ার ক্যাম্পের দিকে। পালানোর সকল সম্ভাব্য পথ তারা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিল।

তবু লাভ হলো না কিছু। পাওয়া গেল না তাঁতিয়াকে। কেমন করে সৈন্য-সামন্ত গোলা-বারুদ কামান-বন্দুক লোক-লস্কর নিয়ে তিনি এমন সতর্ক ইংরেজ বাহিনীর চোখে ধূলো দিয়ে বারবার আত্মগোপন করছেন তা ভেবেই পেলো না ইংরেজরা। অবশ্য কয়েকদিন পরে খবর এলো তাঁতিয়া ঝালোরে। সেখান থেকে ইংরেজের দোসর ঝালোরের রাজার অনেক সৈন্য এবং নগদ পনের লাখ টাকা, ত্রিশটা বড় বড় কামান ও বেশুমার হাতি-ঘোড়া নিয়ে তিনি বহাল তবিয়তে সরে পড়েছেন। ঝালোরের রাজা ইংরেজের সুহৃদ হওয়া সত্ত্বের কিছু করতে পারেন নি। স্বেচ্ছায় চলে গেছে তার বাহিনী। যাদু জানেন নাকি তাঁতিয়া! ভাবে ইংরেজ কর্ম-কর্তারা।

আসলে তাঁতিয়া তোপীর স্বাধীনতা স্পৃহা, তেজদৃপ্ত মনোবল, নজীরবিহীন ত্যাগ, সর্বোপরি দেশপ্রেম দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতো সহজে। সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতো বীর সিপাহীরা। ঝাঁপিয়ে পড়তো অত্যাচারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে। দেশের জন্যে মৃত্যুকে তারা 'শ্যামসম' মনে করতো।

কিছুদিন পর বিশাল বাহিনী নিয়ে তাঁতিয়া গেলেন রায়গড়ে। নিরাপদ মনে হলো না জায়গাটা। সেনা বাহিনী বললো,—'চলুন ইন্দোরে। সেখানকার সিপাহীরা আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।'

বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন ছিল তাঁতিয়ার। হলো না। চললেন ইন্দোরের পথে। হাজির হলেন সেখানে নিরাপদে। ইংরেজ শক্তির মোকাবেলার জন্যে গ্রহণ করলেন পূর্ণ প্রস্তুতি। ওদিকে ইংরেজরাও বসে ছিল না। সমগ্র ভারত তখন প্রায় তাদের পূনর্দখলে। অনেক শক্তি পরাভূত। নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্যেও ইংরেজ বাশ্যতা স্বীকার করে অনেক মহারথ। শুধু তাঁতিয়া তোপীর মতো কয়েকজন অমিততেজ বীর পুরুষ অকুতোভয়। আপোষহীন। তাঁর সাথে এসে জুটেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ফিরোজ শাহ আর রাজা মানসিংহ।

ইংরেজ সেনাপতি মিচেল নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করলেন তাঁতিয়া তোপীর শিবির। কিন্তু সহজে কাবু করতে পারলেন না তাঁকে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো দু'পক্ষের মধ্যে। বিস্তর ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে দিয়ে সে যুদ্ধ চললো প্রায় পাঁচ মাস ধরে।

তাঁতিয়ার বাহিনীর প্রায় নিঃশেষ। কাবু হয়ে পড়লেন তাঁতিয়া। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে সরে পড়লেন তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে।

ইংরেজরা অনুসরণ করলো তাঁকে। সিরঞ্জের গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁতিয়া তোপী। ইংরেজ বাহিনী ঘিরে ফেললো জঙ্গল। সীমিত শক্তি নিয়ে মোকাবেলা করলেন তাঁতিয়া। কিন্তু পেরে উঠলেন না। অবস্থা বেগতিক দেখে কেটে পড়লেন তিনি। হাজার চেষ্টা করেও ইংরেজরা ধরতে পারলো না তাঁকে। ইতিমধ্যে তাঁর জনবল প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। মানসিংহ ফিরে আসতে চাইলেন লোকালয়ে। বললেন,—'নতুন করে সৈন্য-সামন্ত গোলা-বারুদ যোগাড় না করলে যুদ্ধ করবো কি করে ? আমি বরং সে চেষ্টা করিগে।

আসলে জমিদারী ফিরে প্যাবার বাসনা জেগে উঠেছিল তার প্রাণে। এতো কষ্ট সহ্য হচ্ছিল না মানসিংহের। তাঁতিয়া তোপী তখন পেরোনের জঙ্গলে। মানসিংহ তাঁকে যুক্তি দিয়েছিলেন আত্মসম্পর্ণের। রাজি হন নি তাঁতিয়া। বলেছিলেন,—'জীবন থাকতে তা হবে না। আপনি বরং সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করে আমাকে সংবাদ দেবেন। আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়বো ইংরেজের বিরুদ্ধে। সাগর পারে তাদের তাড়িয়ে তবে ক্ষান্ত হবো। দেশবাসী আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।'

মানসিংহ বলেছিলেন,—'দেখি কি করা যায়। আগে তো যাই লোকালয়ে।'

তাঁতিয়ার দেহ মন তখন ভেঙে পড়েছে। গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করে বিশ্রামের নামে চিন্তা করছেন কিভাবে আবার সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করা যায়। কবে আসে মানসিংহের আহ্বান। মানসিংহ নিশ্চয় তাঁকে হতাশ করবেন না। এতদিন কাটিয়েছেন এক সাথে। ইংরেজরা তাঁর জমিদারও কেড়ে নিয়েছে।

ওদিকে মানসিংহ লোকালয়ে গিয়ে ইংরেজদের সাথে যোগাযোগের পথ খুঁজছেন। অনুসন্ধান করছেন ইংরেজ খয়ের খাঁদের। সৈন্য সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি তখন অনীহ। যুদ্ধ-বিগ্রহের নিরুৎসাহিত ইংরেজদের সাথে মীমংসায় আগ্রহী।

শেষ পর্যন্ত সেতুবন্ধ রক্ষিত হলো। ইংরেজ খয়ের খাঁদের মাধ্যমে। ইংরেজ কর্মকর্তা খুশি হয়ে তাঁকে জমিদারী ফিরেয়ে দিতে চাইলেন। তারা আরোপ করলো শুধু একটা শর্ত। তারা বললো, মানসিংহ যদি তাঁতিয়া তোপীকে ধরিয়ে দেন তবে পূর্ণ মর্যাদায় তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাঁর রাজত্ব। বংশ পরম্পরায় জমিদারী ভোগ দখল করতে পারবে তারা।

মানসিংহও তাই চাচ্ছিলেন। জমিদারী ফিরে পাওয়া এবং বিদ্রোহের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়ার উদগ্র বাসনা জেগে উঠলো তাঁর অন্তরে। এতোদিনের দোসর, স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সিংকে ধরিয়ে দিতে তিনি হলেন তৈরি। বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতে তাঁর বুক কাঁপলো না। আত্মসুখ আর পারিবারিক স্বার্থের লালসা তাঁকে পেয়ে বসলো। তিনি ইংরেজদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলেন।

কিছুই জানতে পারলেন না বনবাসী নিঃশঙ্কচিত্ত অকুতোভয় বীরসেনানী তাঁতিয়া তোপী। তিনি তখনো মানসিংহের সংগ্রামী আহ্বানের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

একদিন বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠালেন বনবাসী তাঁতিয়া তোপীর কাছে। এক পত্রে মানসিংহ তাঁকে লিখলেন,—'আপনি বর্তমানে ঠিক কোন জায়গায় কেমন আছেন আমি জানি না। আমার একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠালাম। আপনার বর্তমান কর্মপন্থা জানতে পারলে সাহায্য করতে পারতাম। আমি কিছুটা এগিয়েছি। কানপুর দখল করা সম্ভব হতে পারে। আপনার নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা থাকলে জানাবেন। কোথায় কখন আপনার সাথে দেখা হতে পারে তা আমার জানা দরকার। সত্তর সবিস্তারে সবকিছু জানতে চাই—।'

তাঁতিয়া তোপী দেশীয় বেঈমানের খপ্পরে পড়ে গেলেন। তিনি পুরাতন বন্ধুকে তাঁর পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করে সঠিক উপদেশ চাইলেন। ইংরেজ বাহিনীর সত্যিকার ক্ষমতা আর অবস্থানের গোপন সংবাদ জানানোর জন্যে অনুরোধ করলেন।

এই পত্রই হলো তাঁতিয়া তোপীর জন্যে কাল। মানসিংহ দেরী না করে তার নতুন বন্ধু ইংরেজ সেনাপতিদের সাথে গোপন সাক্ষাৎ করলেন। তাদের উপদেশ চাইলেন। তারা যেন হাতে চাঁদ পেলো। প্রয়োজনীয় সৈন্য রসদ ও অর্থ বিনা দ্বিধায় মানসিংহের হাতে উঠিয়ে দিলো। আর আশ্বাস দিলো কার্য সিদ্ধির পর জমিদারী ফিরিয়ে দেওয়ার।

মানসিংহ আবার গুপ্তচর পাঠালেন তাঁতিয়া তোপীর কাছে। পত্রে লিখলেন,—'দূর থেকে হয় না। লিখিতভাবে সব কথা জানানোও নিরাপদ নয়। আমি নিজেই আসবো আপনার সাথে গোপন সাক্ষাতের জন্যে। আপনি একা থাকবেন সেখানে। কারণ, সাক্ষাতের পর আমাকে আবার ফিরে আসতে হবে লোকালয়ে। কোনো বিশ্বাসঘাতক যদি আমাদের গোপন পরিকল্পনার কথা ইংরেজেদের কাছে পৌঁছে দেয়, তবে আমাদের উভয়কেই ঝুলতে হবে ফাঁসিকাষ্ঠে। পিছিয়ে যাবে স্বাধীনতা সংগ্রাম।'

তাঁতিয়া তোপী মানসিংহের বেঈমানীর কাছে পুরোপুরী পরাজিত হলেন। তিনি কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। তাঁর নির্জন অবস্থানের স্থান আর সময় জানালেন মানসিংহকে।

রাজা মানসিংহ একদল সশস্ত্র অনুচরসহ গভীর রাতে প্রবেশ করলেন জঙ্গলে। সেদিন ছিল ১৮৫৯ সালের ৭ই এপ্রিল। মোনাফেকের ইতিহাস একটা উজ্জ্বল দিন।

তাঁতিয়া তোপী পরম নিশ্চিতে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মানসিংহ সেই বীর সিংহকে নিদ্রিত অবস্থাতেই বন্দী করলেন। নির্বিঘ্নে নিয়ে এলেন ব্রিটিশ শিবিরে। ক্যাপ্টেন মিয়েড তো আনন্দে আত্মহারা। কি করে মানসিংকে বরণ করবেন এবং কিভাবে তাকে সন্তুষ্ট করবেন তিনি যেন ভেবেই পান না। দীর্ঘদিন এক ডজন সেনাপতি পাগলা কুকুরের মতো শিবির থেকে শিবিরে, নগর থেকে বন্দরে, জঙ্গল থেকে জঙ্গলে তাঁতিয়া তোপীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু বিফল হতে হয়েছে তাদের করুণভাবে। সশরীরে সেই তাঁতিয়া তোপীকে হাতে পেয়ে তাই তারা আনন্দে আত্মহারা।

ক্যাপ্টেন মিয়েড সময় নষ্ট না করে তাঁতিয়া তোপীকে তাদের অনাসৃষ্টির আড্ডা সিপ্রিতে নিয়ে গেলেন। তারই উৎসাহ আর উদ্দীপনায় তাড়াহুড়োর মধ্যে বিচার সভা গঠিত হলো। বিচারে সংগ্রামী বীর তাঁতিয়া তোপীকে ১৮ই এপ্রিল প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া

হলো। ফাঁসির আদেশ শুনে অশ্রুসিক্ত হাজার হাজার ভারতবাসী সমবেত হয়েছিল। প্রকাশ্য স্থানে তৈরি করা হয়েছিল ফাঁসির মঞ্চ। ফাঁসি-কাষ্ঠে তাঁকে উঠানোর আগে ক্যাপ্টেন মিয়েড জল্লাদকে বললেন,—'তাঁতিয়ার হাত দুটো পেছনে বাঁধো। তাঁতিয়া তখন ক্যাপ্টেনকে বললেন,—'এতো ভয় তোমাদের ? ফাঁসির মঞ্চেও হাত বাঁধতে হবে ? তা বাঁধো, কিন্তু একা আমি তোপী যাচ্ছি। হাজার তোপী এখনো রইলো বেঁচে। আগামী দিনেও আসবে। তাদের কি এমনি করে বাঁধতে পারবে ? পারবে বিশ্বাসঘাতকদের এই ভাবে কাজে লাগাতে ? আমার সংগ্রাম ব্যর্থ হলো সেজন্য দুঃখ নেই। দুঃখ, আমার জাত ভাই, আমার পরম বন্ধু নিজস্বার্থের জন্যে আমাকে তোমাদের হাতে উঠিয়ে দিলো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সে কলঙ্কিত করলো। এ দুঃখ পরপারে গিয়েও আমি ভুলতে পারবো না। তবে আমার আনন্দ লাগছে এই ভেবে যে, তোমরা সুশিক্ষিত ইংরেজ সেনাপতিরা আমাকে পরাজিত করতে পারোনি। বরং আমার মতো একজন অনভিজ্ঞ প্রশিক্ষণহীন সেনাপতির কাছে বারবার নাজেহাল হয়েছো। সেনাপতি হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধের পথ পরিহার করে বেঈমানীর আশ্রয় নিয়েছো। সামরিক দিক দিয়ে তোমরা যে আমাদের চাইতে দুর্বল, সেটাই প্রমাণিত হলো। শুধু অত্যাচার, সামরিক সরঞ্জাম আর প্রতারণা দিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। যে নীতিতে তোমরা চলেছো তাতে শেষ পর্যন্ত তোমাদের পতন হবেই। মানুষ তোমাদের ঘৃণা করবে। ভালোবাসাবে না। মানুষের ভালোবাসা পেতে হলে নিজেকেও ভালো হতে হয়। তোমরা সেপথ ছেড়ে বিপথে গেছো। এমন দিন আসবে যেদিন আবার নতুন করে হাজার হাজার তোপী জেগে উঠবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমাদের মতো অত্যাচারীদের উপর। বেঈমানীর প্রতিশোধ সেদিন তারা গ্রহণ করবে। দেরী হতে পারে। কিন্তু তা হবেই।'

তাঁতিয়ার কথায় উপস্থিত ভারতবাসীরা স্থির থাকতে পারলো না। ডুকরে কেঁদে উঠলো। ভুলে গেলো ইংরেজদের উপস্থিতি।

প্রকাশ্যে ফাঁসি হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা সংগ্রমীর।

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতার কথা আসে। সেটাও ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। মানুষ ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে কতো হীন হতে পারে, কতো নীচে নামতো পারে, এটাও তার জলন্ত উদাহরণ।

অযোধ্যার ফয়জাবাদে আহমদউল্লাহ শাহ নামে একজন তালুকদার ছিলেন। তালুকদার হলেও শিক্ষিত মৌলবী ছিলেন তিনি। তাকে দেখে মনে হতো, শান্ত-শিষ্ট-সৌম্য -বিজ্ঞ এক ব্যক্তিত্ব। মানুষের প্রতি অতিশয় দরদী। কিন্তু ভেতরে ছিল তাঁর সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জলন্ত লাভা। তেজপুঞ্জ যেন সংহত সংযত হয়ে থাকতো।

লর্ড ডালহৌসীর স্বত্বলোপ নীতির শিকার হন তিনিও। তালুকদারী থেকে বঞ্চিত করা হয় তাকে। কেড়ে নেওয়া হয় সমস্ত ধন-সম্পত্তি। একদিনেই তিনি জমিদার থেকে হন পথের ভিখারী। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জ্বলে ওঠে তখন। বারুদের গুদামে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটে। ছদ্মবেশে তিনি অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে পথে নামেন। এক ক্যান্টনমেন্ট থেকে অন্য ক্যান্টনমেন্টে ভারতীয় সিপাহীদের উত্তেজিত করতে থাকেন। বিদ্রোহের জন্যে করতে থাকেন তাদের উদ্ধুদ্ধ।

প্রথম দিকে ইংরেজরা বুঝতে পারে নি। ব্যারাকপুর, মীরাট, এলাহাবাদ কানপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজদের টনক নড়ে। গুপ্তচর মারফত তারা জানতে পারে মৌলবী আহমদউল্লাহ শাহর কারসাজি। কিন্তু বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় তখন মৌলবী সাহেবের প্রতি নজর দেওয়ার অবকাশ তারা পাননি। তাঁকে ধরতেও পারেনি। পায় হেঁটে ছদ্মবেশে তিনি ঘুরে বেড়ান এক-স্থান থেকে অন্যস্থানে। তেজময়ী বক্তৃতায় মানুষকে স্বাধীনতা মন্ত্রে করেন উদ্দীপ্ত। মানুষ পাগল হয় তাঁর বক্তৃতা শুনে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ইংরেজ নিধনে।

দিল্লী পুনর্দখলের পর ইংরেজদের সাহস যায় বেড়ে। তারা একে একে বিভিন্ন প্রদেশে চালায় প্রতিশোধমূলক হামলা। বহু ক্ষয়ক্ষতির পর কানপুর আর অযোধ্যা তারা পুনরাধিকার করতে পারে। নিরীহ মানুষও তখন ইংরেজ অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়। মান সন্মান, অর্থ-সম্পদ, এমন কি প্রাণ হারায় অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তি। স্থির থাকতে পারেন না আহমদ শাহ। এতদিন তিনি বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছেন, এবার করেন জেহাদ ঘোষণা। পতঙ্গের মতো মানুষ দলে দলে সমবেত তাঁর পতাকাতলে। সমগ্র অযোধ্যায় আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংরেজ সরকার তখন তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে। কিন্তু অযোধ্যায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে সাহস পায় না। তারা অক্ষমতা প্রকাশ করে। কর্তৃপক্ষেকে জানায়,—'এমন জনপ্রিয় সর্বমান্য ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে গেলে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধে যাবে।' সরকার বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনীকে আদেশ দেন।

মিলিটারী অফিসাররা অনেক সাবধানে, অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে, আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তবে মৌলবী আহমদ শাহকে গ্রেফতার করে। সামরিক আইনে তাঁকে বিচার করে ফাঁসির হুকুম দেয়। তারা ভেবেছিল, এইভাবে মৌলবী সাহেবকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলে অযোধ্যার ফয়জাবাদ শান্ত হবে। এদিকে ওদিকে আরো যে দু'চারজন ইংরেজ বিদ্বেষী আছে, ভয় পেয়ে তারাও বিদ্রোহের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। আনুগত গ্রহণ করবে ইংরেজ সরকারের। কিন্তু ফল হলো উল্টো।

ফয়জাবাদের অধিবাসীরা আহমদ শাহর প্রতি সরকারের সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবে মেনে নিলো না। তারা প্রকাশ্যে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। তাদের সাথে যোগ দিলো ইংরেজ শিবিরের দেশীয় সিপাহীরা। অবস্থা বেগতিক দেখে সিপাহীদের প্যারেড ময়দানে জমায়েত হওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। সিপাহীরা অমান্য করলো সে আদেশ। প্যারেড গ্রাউন্ডে জমায়েত হওয়ার পরিণতি তাদের জানা ছিল। তাই তারা দেরী না করে দেশপ্রেমিক মৌলবী-ভক্ত বিদ্রোহী জনগণের সাথে মিশে গেলো। হামলা চালালো ইংরেজ কর্মকর্তাদের উপর। সহজে পরাস্ত করলো তাদের। বন্দী করলো ইংরেজদের। দখল করলো শহর। তারপর হামলা চালালো জেলখানায়। মুক্ত করলো ফাঁসির আসামী মৌলবী আহমদউল্লাহ শাহ'কে। নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালো তাঁকে। সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের আবদার রক্ষা করলেন মৌলবী সাহেব। সিপাহীদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন,—'বন্দী ইংরেজদের তোমরা কী করবে ? কেমন ব্যবহার করতে চাও তাদের সাথে ?

—'ওদের হত্যা করবো আমরা। ওরা দেশবাসীর সাথে যে ব্যবহার করেছে, বিনা দোষে যেভাবে হত্যা করেছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে, আপনার মতো সর্বমান্য ব্যক্তিকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে, তাতে মৃত্যুই ওদের একমাত্র শাস্তি।' উপযুক্ত সাজা। সমস্বরে জানালো বিদ্রোহী সিপাহীরা।

মৌলবী আহমদ শাহ বললেন,—'ওরা অধম, তাই বলে আমরা উত্তম হবো না কেন ? আমি ওদের মুক্তি দিতে চাই। পাঠাতে চাই ফয়জাবাদের বাইরে। তাদের পথ খরচের ব্যাবস্থাও করতে চাই। আমি চিরদিনের জন্যে শত্রুমুক্ত রাখতে চাই ফয়জাবাদ।'

—'প্রাণের মায়ার এখন আপনার প্রস্তাব মেনে নিলেও পরে ওরা আবার আক্রমণ করবে ফয়জাবাদ। ওদের বিশ্বাস করার কারণ নেই। অফিসারগুলোকে শেষ করে ফেলাই উচিত।'

—'আমি তোমাদের কথা বুঝিনা, তা নয়। ওরা বেঈমান, হিংস্র। সামান্য সৌজন্যবোধও ওদের নেই। কিন্তু আমি একটা সুযোগ তাদের দিতে চাই। ক্ষমার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দিতে চাই। ওদের হত্যা করলে একদিন না একদিন ইংরেজ সৈন্য ফয়জাবাদে আবার হামলা চালাবে। কিন্তু ক্ষমা করলে, মানবতা দেখালে, সেটা নাও করতে পারে। ওরাও তো মানুষ ? দেখি না একবার পরীক্ষা করে।' বিদ্রোহী সিপাহীরা মেনে নিলো নেতার আদেশ। ক্ষমা করলো সবাইকে। পথ খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দিলো দূরের ইংরেজ শিবিরে।

আহমদ শাহ সম্বন্ধে ইংরেজ ঐতিহাসিক ম্যালেনস্ লিখেছেন,—'মৌলবী একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উদারচেতা দেশপ্রেমিক ছিলেন। সামরিক দক্ষতাও ছিল তাঁর তুলনাহীন। বারবার তিনি ইংরেজ সেনাপতি কলিনকে পরাজিত করেছিলেন। সেদিনের জন্যে সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। কিন্তু বেঈমানীর মাধ্যমে এই মহৎ ব্যক্তিকে পরাজিত এবং নিহত করা হয়েছিল। সেটা সত্যিই দুঃখজনক এবং অপমানজনক ব্যাপার।'

'কোনো ব্যক্তি যদি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে, শত্রুর মোকাবেলা করে তবে তাঁকে নিশ্চয় দেশপ্রেমিক বলা হয় মৌলবী আহমদ শাহ সেই ধরনের একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক। তিনি যুদ্ধ করেছেন ঠিকই। কিন্তু যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কখনো তরবারি ব্যবহার করেন নি। অপ্রয়োজনে মানুষ হত্যায় তাঁর তরবারি করেন নি কলঙ্কিত। অনুসারীদেরও করতে দেন নি। তিনি যুদ্ধ করেছেন বিদেশী শক্তির সাথে। তারা তাঁর দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল বলেই তিনি অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিলেন। সেটা দেশপ্রেমিকের কাজ। পৃথিবীর সব দেশে, সব কালে এরা সন্মানীয়, আদর্শ স্থানীয়। স্বাধীনতাস্পৃহার প্রতি তাই সবার শির নত। সমস্ত পৃথিবীর মানুষ আজ তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।'

ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে সমগ্র পৃথিবীর বীরপূজারীদের কাছে আহমদ শাহ আদর্শ দেশপ্রেমিক এবং সন্মানিত হলেও ভারতবর্ষের মানুষ তাঁকে ভুলে গেছে। তাঁর কথা বেশি একটা উচ্চারিত হয় না। সেদিন ইংরেজ শক্তি তাঁকে সন্মুখ সমরে পরাস্ত

করতে না পারলেও স্বার্থপর ভারতবাসী বেঈমানীর মাধ্যমে তাঁকে নিঃশেষ করতে পেরেছিল। ইংরেজ সেনাপতিরা আহমদ শাহকে বন্দী করার জন্যে ফয়াজাবাদ ছাড়াও কানপুর, লখনৌ, শাহাদতগঞ্জ, শাহজাহানপুর, বেরিলী প্রভৃতি স্থানে অনুসরণ করেছে। কিন্তু চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে তাদের সকল প্রচেষ্টা। কিছুতেই তাঁকে বন্দী করতে পারেনি। অবশেষে বেঈমানীর আশ্রয় নেয় তারা। সে ব্যাপারে কাজে লাগায় মৌলবীর বন্ধুকে। লোভ-লালসা, ব্যক্তিস্বার্থ প্রভৃতি মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করে জগন্নাথ সিংকে বেঈমানীতে লিপ্ত করতে পারে ইংরেজ কর্মকর্তারা।

এর আগে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কারের লোভ দেখানো হয় সে দিনের স্বার্থপর বেঈমানদের। বলা হয়, যে ব্যক্তি মৌলবী আহমদের মাথা এনে দিতে পারবে, তাকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। ইচ্ছা করলে সে টাকায় ঐ ব্যক্তি যে কোনো লাভবান স্থানে জমিদারী খরিদ করতে পারবে। তাছাড়া বংশ পরম্পরায় চিরদিনের জন্যে ইংরেজদের বন্ধুতে পরিণত হবে।

অনেকে অনেক ব্যাপারে সেদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ইংরেজদের সুনজরে পড়ার জন্যে। নিরীহ ব্যক্তিদের বিদ্রোহী নামে মিথ্যা করে ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আহমদ শাহকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে সাহায্য করতে চায়নি। পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভে হেলায় উপেক্ষা করেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কর্মকর্তারা পবাইনের রাজা দুষ্টের শিরোমণি আহমদ শাহর বন্ধু জগন্নাথ সিংকে বাগে আনতে সক্ষম হয়েছিল। পঞ্চাশ হাজার টাকা বাদেও আরো হাজার সুযোগ সুবিধের আশ্বাস তাকে দেওয়া হয়। জগন্নাথ সিং বেঈমানীতে অবতীর্ণ হন।

আহমদ শাহ তখন সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত। নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান তিনি অযোধ্যায় ইংরেজ শিবিরের উপর। অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও নাস্তানাবুদ করতে চান তাদের। গোপন খবর পেয়ে পবাইনের রাজা খবর পাঠালেন,—'মৌলবী সাহেব দয়া করে আমার প্রাসাদে আসুন। সঙ্গীসাথী বেশি আনবেন না। ইংরেজরা জানতে পারলে আমার উপর অত্যাচার করবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমি পরোক্ষে আপনাকে সাহায্য করতে চাই। টাকা-পয়সা, গোলা-বারুদ ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সৈন্য আপনাকে দেবো। তবে ব্যাপারটা গোপন রাখাত হবে। একবার জয়লাভ করতে পারলে জানাজানি হওয়ায় দোষ নেই। আপনি নিজে আসলে আমি খুশি হবো। লেনদেনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।'

তাঁর সাথে কেউ বেঈমানী করতে পারে চিন্তাই করতে পারতেন না আহমদ শাহ। সবাই তাঁকে মান্য করে এটাই তিনি জানেন। জগন্নাথ সিংকে তাই তিনি অবিশ্বাস করেন নি। খুশি হয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালে ৫ই জুন তিনি একটি হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে কিছু সংখ্যক অনুচর নিয়ে হাজির হলেন রাজা জগন্নাথ সিংয়ের প্রাসাদের সামনে। পত্র অনুযায়ী সংবর্ধনা জানানোর জন্যে প্রাসাদের সম্মুখে হাজির থাকার কথা জগন্নাথ সিংয়ের, কিন্তু মৌলবী সাহেব দেখলেন কেউ কোথাও নেই। সদর দরজাও বন্ধ। অবাক হওয়ার পালা। সন্দেহ হলো মনে। মাথা উঁচু করে তাকালেন তিনি প্রাসাদের দোতালার

দিকে। দেখলেন ছাদের উপরে জগন্নাথ সিংয়ের সৈন্য বাহিনীর সদস্যেরা পজিশন নিয়ে যেন আদেশের অপেক্ষায় বসে আছে। হাতে সঙ্গীণ। আহমদ শাহ ভাবলেন, নির্ধারিত সময়ের আগেই পৌঁছে গেছেন তিনি। রাজা এখনো প্রস্তুত হতে পারেন নি। ওরা তাই অপেক্ষা করছে। এমন সময় তাঁর এক সঙ্গী ঈশারায় দেখালো জগন্নাথ সিং ও তাঁর ভাইকে।

মৌলবী আহমদ শাহ হেসে ফেললেন। বললেন,—'ছাদে কেন রাজা মশাই ? ব্যাপার কি ?'

—'ব্যাপার আর কি ? নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আর ইংরেজের বন্ধুত্ব। আজ আপনার জীবনের শেষদিন।

—'বলেন কি ? এতো বড় বেঈমানী ? ঠিক আছে, আসুন। আমিও একেবারে নিরস্ত্র নই। এতোদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছি। আজ স্বদেশীর সাথে করবো ঈমানের পরীক্ষা। হয়ে যাক এক হাত।' তারপর মুখে ঘুরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'কী বুঝছো ? প্রস্তুত হও। হাতিয়ার বের করো। রাজার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। বেঈমানীর শিক্ষা—'

কথা শেষ হলো না। উপর থেকে একটা গুলি এসে লাগলো আহমদ শাহ'র গায়ে। হাতির পিঠ থেকে পড়ে গেলেন তিনি মাটিতে। গুলীটা কোনো সেনা ছোঁড়েনি। রাজার আদেশে কেউ আঘাত করতে চায়নি সর্বমান্য মৌলবীকে। তাই বাধ্য হয়ে জগন্নাথের ছোট ভাই করেছিল কাজটা। গুলী ছোঁড়ার বীরত্বটা দেখিয়েছিল আহমদ শাহ'র উপর।

মৌলবী সাহেবের সঙ্গী-সাথী বেশি ছিল না। সহজে জগন্নাথ পরাস্ত করতে পারলো তাদের। তারপর আহমদ শাহ'র মাথাটা কেটে নিয়ে হাজির হলেন শাহজাহানপুরে। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে মাথাটা দিয়ে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে জগন্নাথ সিং ফিরে এলেন প্রাসাদে। দেশের কতো বড় সর্বনাশ তিনি করলেন, জাতির মুখে কতো গভীর কালি তিনি লেপন করলেন তা তিনি বুঝতে পারলেন না।

শাহজাহানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট আহমদ শাহ'র মাথাটা শহরের উন্মুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখলেন। দেশবাসীকে বোঝাতে চাইলেন, ইংরেজদের সাথে সংগ্রামের এটাই একমাত্র পরিণতি।

এইবাবে ভারতবাসীর বেঈমানীর আরেকটি অধ্যায় রচিত হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে।

সাত

ক্রমাগত প্রতারণা প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীতে দেশদরদীদের নির্মূল করা হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে আবার ইংরেজেরা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছিল।

বিশ্বের মানুষের কাছে ইংরেজ সরকার সেদিন দেখাতে চেয়েছিল কতিপয় অশিষ্ট অপরিণামদর্শী সাধারণ মানুষ দিল্লীতে উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ডগলাস, জেনিংস, মেডকাফ প্রভৃতি ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করে বিভীষিকা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। সত্যিকার আজাদীর সংগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৮৫৭ সালে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য নয়, করেছিল এনফিল্ড রাইফেলের চর্বি মাখা কার্তুজ ব্যবহারের প্রতিবাদে। সেটাকে বিপ্লব কিংবা সংগ্রাম বলা চলে না। তাই গণহত্যার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন বসিয়ে দুস্কৃতকারীদের বিচার করতে হয়েছিল। দিতে হয়েছিল উপযুক্ত শাস্তি। নিরপেক্ষ বিচারের মাধ্যমেই দেওয়া হয়েছিল সে সাজা।

কি ধরনের নিরপেক্ষ বিচার তারা করেছিলো তারই নজির হিসেবে একটা বিচারের কাহিনী এখানে বর্ণিত হলো।

ইতিহাস কালের পাতায় যে সাক্ষাই দিকনা কেন, তৎকালীন ইংরেজ সরকার চেয়েছিল নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে। বিশ্বকে ভুল বোঝাতে। মহান আজাদী সংগ্রামকে হত্যা, লুণ্ঠন আর রাহাজানিতে প্রতিভাত করতে।

সিপাহী বিদ্রোহের চার বছর পর মোগল বেগ নামক একজন সাধারণ লোককে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে দিল্লী শহরের হত্যাযজ্ঞের নায়ক হিসেবে খাড়া করেছিল ইংরেজ সরকার। ভারতীয় সাক্ষীর সাহায্যে সেই জঘন্য মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে চেয়েছিল ওরা।

মোগল বেগের বিরুদ্ধে প্রথম সাক্ষী হিসেবে যাকে হাজির করা হয় তার নাম মহারাজ সিং। পিতার নাম মথুর সিং। মৃত ইংরেজ ক্যাপ্টেন ডগলাসের অন্যতম আরদালি হিসেবেই তাকে পরিচিত করানো হয়। সে তার সাক্ষ্যে বলেঃ—

—'১১ই মে সকাল আটটার দিকে একজন খবরগীর ক্যাপ্টেন ডগলাসকে এসে বলে,—'সম্রাট বাহাদুর শাহের বাসভবনের নিচের তলায় অনেক সৈন্য জড়ো হয়েছে। তাদের হাবভাব বিশেষ সুবিধের নয়। সম্রাটের সাথে দেখা করার জন্যে তারা চেচামেচি করছে। বেশ উত্তেজিত মনে হলো তাদের।'

'ক্যাপ্টেন ডগলাস তখন সম্রাটের সাথে দেখা করতে যান। আরদালি হিসেবে সাথে যায় চাপরাসি মুসাহিব খাঁ আর জমাদার পুরণ সিং। আমি তখন বাসাতেই থাকি।'

'পুরণ সিং এর কথা শুনে আমি বাইরে যাই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, নিচে অনেক উত্তেজিত জনতা ডগলাস সাহেবকে কি যেন বলছে। ফ্রেজার সাহেব বগীতে চড়ে সেদিকেই আসছেন। একটু পরেই ডগলাস সাহেব ভীত হয়ে ক্যালকাটা গেটের দিকে ছুটে যান। তারপর সেখানকার জলপ্রণালীর মধ্যে লাফিয়ে পড়েন। আমি ছুটে যাই নিচে। পুরণ সিং মুসাহিব খাঁ এবং কষিণ সিংও আমার সাথে যায়। ডগলাস সাহেবের কাছে গিয়ে দেখি, তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন। তখন ধরাধরি করে আমরা তাকে উপরে নিয়ে আসি শুইয়ে দেই তার বিছানায়।'

'কিছুক্ষণ পরেই আবার নিচ থেকে হট্টগোলোর শব্দ শোনা যায়। আমাদের মনে হয়, অসংখ্য লোক আমাদের আক্রমণ করতে আসছে। ব্যাপারটা জানার জন্যে বারান্দায় যাই। সেখান থেকে দেখি, ফ্রেজার সাহেব রক্তাক্ত দেহে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় দেখি এই বন্দী মোগল বেগ, বিলায়েত খাঁ এবং হাজী খাঁ তরবারির সাহায্যে আঘাত করছে ফ্রেজার সাহেবের দেহে। তিনি মেঝের উপরে পড়ে যান। তারপরে ভয়ে আমি চলে যাই ঘরে। সমস্তকথা বলি সাহেবদের। আমার অবস্থা দেখে সাহেবরাও ভয় পেয়ে যান। জেনিংস সাহেব সাহস করে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকান। বাইরের ভয়াবহ অবস্থা দেখে দু'হাতে তিনি চোখে ঢাকেন। তারপর ফিরে আসেন আহত ডগলাস সাহেবের কাছে। বলেন,—'সর্বনাশ হয়েছে। মুসলমানেরা খেপে গেছে; মানুষকে তারা গরুর মত করে জবাই করছে। ফ্রেজার সাহেবকে হত্যা করেছে। আমাদের নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া উচিত। ওরা উপর তলাও উঠতে পারে।

'আমরা যখন সবাই আত্মগোপন করার জন্য ব্যস্ত, সাহেবরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছোটাছোটি করছেন, ঠিক তখনই মোগল বেগ, এবং আরো কয়েকজন লোক তরবারি হাতে প্রবেশ করে দোতলার ঘরে। বিনা কারণেই হত্যা করে সাহেবদের। কোনো ইংরেজই তাদের হাত থেকে রেহাই পায় নি।'

এরপর হাজির করা হয় দ্বিতীয় সাক্ষী বখতারওর সিংকে। তার পিতার নাম মল সিং। জাতিতে ব্রাক্ষ্মণ। বয়স ৪৬ বছর। পেশা চাকরি বাসস্থান দিল্লী।

সে ছিল মৃত ক্যাপ্টেন ডগলাসের চাপরাসি। আঠারো বছর যাবত ছিল সে প্রাসাদ রক্ষী বাহিনীর সদস্য। তার বিবৃতি মোটামুটি প্রথম সাক্ষীর অনুরূপ।

তৃতীয় সাক্ষী হিসেবে যাকে হাজির করা হয় যাকে সেও ছিল একজন নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী। তার নাম কিষণ সিং। পিতার নাম রঘুনাথ সিং। বয়স ৩৮ বছর। জাতিতে ব্রাক্ষ্মণ। পেশা চাকরি। নিবাস দিল্লী।

তার সাক্ষ্যে নতুন কিছু ছিল না। প্রথম সাক্ষ্যের পুনরাবৃত্তি। চতুর্থ সাক্ষী হিসেবে যে উপস্থিত হয় তার নাম জঠমল সিং। পিতার নাম বুধ সি। বয়স ৫২ বছর। পেশা চাকরি। বাসস্থান দিল্লী।

তার কথায়ও নতুনত্ব কিছু ছিল না। বিভিন্ন জন ছিলো বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন লোকের সাথে। কিন্তু তাদের বিবরণ ছিল মোটামুটি একই। আসামী মোগল বেগই যে সকল

হত্যাযজ্ঞের হোতা, সেই যে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় তাদের চোখের সামনে দিয়েছি সেটাই ছিল সকল সাক্ষীর বক্তব্যের মূল কথা। তাই তাদের সাক্ষ্যের বিস্তারিত বিবর দেওয়া হলো না।

এরপর যে ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির করা হয় সে প্রত্যক্ষদর্শী কে নয়। সে একুশ বছরের একজন বালুচ মুসলমান যুবক। নাম দীদার বখস। পেশা উ চালনা।

সে বলে,—'বিদ্রোহ থেমে গেলে দিল্লীতে মোগল বেগের নামে গ্রেফতারী পারোয়ান বের হয়েছে শুনে আমি তৎপর হই। দেরী না করে যাই জয়পুরের ক্যাপ্টেন গোলাম খাঁ কাছে। কারণ, শুনেছিলাম মোগল বেগ সেখানেই আছে। তার অধীনেই চাকরি করে মোগল বেগ নামে একজন আরদালি সেখানে আছে বলে তিনি আমাকে জানান। আমি সঙ্গে সঙ্গে সে গোপন সংবাদ একটা পত্রের মাধ্যমে দিল্লির পলিটিক্যাল এজেন্টকে জানিয়ে দেই।'

'ইতিমধ্যে বিশেষ কারণে আমাকে কয়েকদিনের জন্য বরোদায় যেতে হয়। বরোদ থেকে ফিরেই আমি জয়পুরে মোগল বেগের খোঁজ করি। জানতে পারি মোগল বেগ আত্মগোপন করেছে। ব্যাপারটা সে জেনে ফেলেছে।'

'তবু আমি হাল ছাড়িনি। তাকে খুঁজে বের করার জন্যে কোয়েটায় যাই। কারণ, মোগল সেখানে গিয়েছে বলে আমি জানতে পারি। কোয়েটায় অনেক খোঁজখুজি করেও তাকে পাইনি। অবশেষে খুসলে নামক এক ব্যক্তির নিকট থেকে জানতে পারি যে মোগল বেগ সিন্ধুর হায়দারাবাদে চলে গেছে। আমি তখন হায়দারাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। অনেক অনুসন্ধানের পর শিকারপুরে তাকে আবিষ্কার করি। পরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তাকে খুঁজে পেতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল। যেখানে গিয়েছি সেখানেই শুনেছি, হ্যাঁ, মোগলবেগ এখানে ছিল কিন্তু চলে গেছে কয়েকদিন আগে। অমুক জায়গায় গেছে। ছুটেছি আবার সেখানে।'

এই সাক্ষীর বিবৃতি থেকে বোঝা যায়, একজন সামান্য উট চালক হয়েও সে মোগল বেগকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে উল্কার মতো সর্বত্র ছুটে বেড়িয়েছে।

কিন্তু কেন ? কিসের জন্যে সে এমন কাজ করেছে ? দেশের প্রতি প্রচলিত আইন-কানুন কিংবা ন্যায় নীতির প্রতি অনুরক্ত হওয়ার কারণেই কি সে এমন করেছে ? নিশ্চয় নয়। তার মতো শত শত দরিদ্রকে সেদিন অর্থের লোভে কাজে লাগানো হয়েছিল। কাঁটা দিয়ে কাঁটা উপড়ানোর কাজে লাগাতে চেয়েছিল ইংরেজরা।

যেসব ব্যক্তি রুটি-রুজির জন্য বিদেশী শক্তির নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করেছিল। কেমন করে আদালত তাদের নিকট থেকে সত্য এবং সঠিক সাক্ষ্য আশা করতে পারে ? তাদের প্রদত্ত বিবরণ কিছুতেই নির্ভুল এবং নিরপেক্ষ হতে পারে না। সে কথা ইংরেজ বিচারকগণ বোঝেন নি। তারা এই সব বিশ্বাসঘাতক বেঈমানের মিথ্যে বানোয়াট সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেই শাস্তি দিয়েছিলেন বন্দীদেরকে।

সাক্ষীদের বক্তব্য শেষ হলে আদালত মোগল বেগকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়। মোগল বেগ বলে,—'আমি মোগল বেগ। আমার পিতার নাম মীর্জা জাহান বেগ।

আমার বয়স বর্তমানে ৩৫ বছর। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের আগে আমি দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ'র অধীনে চাকরি করতাম। কয়েকবছর পরে আমি সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ক্যাপ্টেন হায়দার হোসেনের অধীনস্থ বাহিনীতে সিপাহী হিসেবে যোগদান করি। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী অধিকার করা পর্যন্ত আমি সেই পদেই বহাল ছিলাম।

'মিঃ হাচিনসন, ক্যাপ্টেন ডগলাস ও মিঃ ফ্রেজারকে সেদিন মারা হয় সেই ১১ই মে তারিখে আমি আলী আহমদের বাড়িতে ছিলাম। সাক্ষীদের বিবরণে শুনলাম যে বেলা দশটায় আগেই ওইসব সাহেবদের প্রাণহানি ঘটেছিল। অথচ এগারোটা পর্যন্ত আমি আলী আহমদ সাহেবের বাসায় ছিলাম। এগারোটার পরে গিয়েছিলাম লালকুয়ার বখ্‌ত সাহেবের বাসায়। বারোটা পর্যন্ত থাকি সেখানে। তারপর যাত্রা করি শাহীমহলের উদ্দেশ্যে। তাহলে বেলা দশটার আগে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কি করে আমাকে জড়ানো যায়? কেমন করেই বা দীর্ঘ চার বছর পর সে সে হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামী হিসাবে আমাকে বিচার সভায় হাজির করা যেতে পারে? অন্যের দোষ আমার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। কোথাও না কোথাও ভুল হচ্ছে। কারণ, আমি যখন লাহোর গেটে হাজির হয়েছিলাম তার অনেক আগের সাহেবদের জিনিষপত্র লুট হয়েছিল। লাহোর গেটে সে সব জিনিষপত্রের অনেক কিছু আমি পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।'

'শুধু তাই নয়, আমার শাহীমহলে পৌঁছানোর আগেই শহরের কয়েকটা স্থানে ইংরেজ হত্যা সংঘটিত হয়েছিল, কোতায়ালীর অনতি-দূরে দুইজন ইংরেজের মৃতদেহ আমি দেখেছিলাম। আরো দূরে অর্থাৎ লাল দীর্ঘির নিকটে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মৃতদেহও আমি দেখেছিলাম।'

আদালতের প্রশ্নঃ—'তুমি যখন জোয়ান বখ্‌ত সাহেবের বাসায় ছিলে তখন তোমার পরিচিত কেউ কি সেখানে ছিল?'

—ছিল। বেশ কয়েকজন ছিল।

— তাদের কারো নাম এখন তোমার মনে আছে?

—জ্বী আছে। ভোলা সিং, আশরাফ বেগ, কেরামত আলী, মীর মহসীন, আসগর খাঁ, হিম্মু করিম খাঁ, মজু সিং প্রভৃতির নাম এখনো আমার মনে আছে। এরা যদি নির্ভয়ে আজ সত্যিকথা প্রকাশ করতে পারে তবে নিশ্চয় আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

—তুমি কখন দিল্লী ত্যাগ করেছিলে?

—সে অনেক পরে। ইংরেজ বাহিনী বিদ্রোহীদের কাছ থেকে রাজধানী ছিনিয়ে নেওয়ার পরও আমি দিল্লীতে ছিলাম। কিন্তু তখন শহরের মুসলমান অধিবাসীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিলো। ফলে প্রাণভয়ে আমি শহর ত্যাগ করি। অনেক কষ্টে শহরের বাইরে চলে যাই।

আদালতের পুন প্রশ্নঃ—'তুমি যদি হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত না থাকবে তবে এতোগুলো সাক্ষী তোমার বিরুদ্ধে এসব বলছে কেন? তারা তো তোমার পরিচিত।'

—পরিচিত ঠিকই, কিন্তু ভুল করছে। ইচ্ছে করেই হয়তো মিথ্যে বলছে।

—মিথ্যে বলার কি কারণ ?

—আমার মনে হয় নামে গন্ডগোলেই এটা হচ্ছে। ওরা মোগলের নামেই ধরিয়ে দিয়েছে। এখন নিজেরা বাঁচার জন্য দোষ চাপাচ্ছে আমার ঘাড়ে।

—সেটা কেমন ?

—বিলায়েত আলী লাল কেল্লার ভেতরে থাকতো। সে মাহবুব আলী খানের আরদালি ছিল। মোগল নামেই সে পরিচিত ছিল। সবাই তাকে মোগল নামেই চিনতো। সে হয়তো হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল। তারই নাম হয়তো প্রথমে বলেছিল। তাকেই এরা সেদিন দেখেছিল। খোঁজখুঁজি হয়তো করা হয়েছিল তাকে। কিন্তু পায়নি। দাদীর বখ্‌তের হয়তো মনে হয়েছিল আমার কথা। ধরা পড়েছি আমি। তাই আমার কথা বলছে। আমাকেই আসামী বানাচ্ছে।

—মোগল কোথায় আছে তুমি কি জানো ?

—সে মারা গেছে। দিল্লী শহরের যুদ্ধের সময় সে নিহত হয়। সম্রাটের বাহিনীতে সে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করেছিল।

—তুমি কি কখনো মাহবুব আলী খানের আরদালি ছিলে ?

—না, আমি কখনো মাহবুব আলী খানের আরদালি ছিলাম না।

—তবে তুমি কি বলতে চাও এতোগুলি লোক মিথ্যে বলছে ?

—এরা প্রত্যেকেই ছিলো অভাবী। তারা নানা সময় দান খয়রাত নেওয়ার জন্যে সম্রাটের কাছে আসতো। সম্রাট তা পছন্দ করতেন না। ফলে আমি তাদের বিদেয় করে দিতাম। সম্রাটের সামনেই যেতে দিতাম না। তারা তখন মনক্ষুণ্ন হয়ে বলতো,—'তোমার জন্যেই আমরা সম্রাটের নিকট থেকে সাহায্য পেলাম না।' আমার মনে হচ্ছে, ওই সময়কার রাগের প্রতিশোধ তারা এখন সুযোগ পেয়ে নিচ্ছে।'

অতঃপর বন্দীর উল্লেখিত ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিচার কার্য্য মুলতবী ঘোষণা করা হয়।

১লা ফেব্রুয়ারী আবার বিচার সভা আরম্ভ হলে মোগল বেগের সাক্ষী হিমুকে আদালতে হাজির করা হয়। ১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখের ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে,—'আমি জোয়ান বখতের আরদালি ছিলাম। প্রতিদিন সকালে আমাকে তার বাসায় যেতে হতো। বিদ্রোহের দিনও আমি সকালে সেখানেই ছিলাম। আমার মনিবের বাসভবন ছিল লালকুয়ায়। সে দিন আমার একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে আমি মোগল বেগকে দেখতে পাই। সাধারণতঃ আমি জোয়ান বখ্‌ত সাহেবের সাথেই শাহীমহলে যেতাম। কিন্তু সেদিন আমার মনিব শাহীমহলে যাননি। কাজেই একাকী আমাকেই শাহীমহলে যেতে হয়েছিল। বেলা তখন ১২টার বেশি হবে।'

আদালতের প্রশ্নঃ—'তুমি যখন শাহীমহলের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলে তখন মোগল বেগ কি তোমার সাথে গিয়েছিল ?

—না, সে যায়নি। সে তখনো বখ্‌ত সাহেবের বাসায় ছিল।

—তুমি কি তাকে আগে থেকেই চিনতে ?

—জ্বি, চিনতাম।

এরপর দ্বিতীয় সাক্ষী আশরাফ আলীকে হাজির করা হয়। সে বলে,

—'আমি সম্রাটের অধীনে চাকরি করতাম। আমার কাজ ছিল জোয়ান বখ্‌ত সাহেবের বাড়ি পাহারা দেওয়া। ১১ই মে বেলা একটা পর্যন্ত আমি সেখানে ছিলাম। বেলা দেড়টার দিকে আমি নিজের বাড়িতে ফিরে আসি।'

—বাড়ি যাওয়ার সময় মোগল বেগকে কি তুমি সেখানে দেখেছিলে ?

—না, তখন দেখিনি, মোগল বেগ তার কিছু আগে চলে গিয়েছিল।

—সে কি সকালে ছিল ?

—ছিল। অনেকে বেলা পর্যন্ত ছিল।

এরপর ভোলা সিংকে আদালতে হাজির করা হয়। সে বলে,—'আমি সম্রাটের অধীনে একজন কর্মচারী ছিলাম। ঘটনার দিন সকালে আমার ডিউটি ছিল না। বিকেলে ডিউটি ছিল জোয়ান বখ্‌ত সাহেবের বাসায়। বারোটার সময় আমি বখ্‌ত সাহেবের বাসায় যাই। বখ্‌ত সাহেব সেদিন বাসাতেই ছিলেন। প্রাসাদে যান নি।

—মোগল বেগকে কি তুমি সেখানে দেখেছিলে ?

—হ্যাঁ, মোগল বেগকেও আমি সেখানে দেখেছিলাম। বারোটা পর্যন্ত সে সেখানে ছিল।

—তাঁর পরিধানে কেমন পোষক ছিল ?

—প্রতেকদিন যেমন পোশাক থাকতো।

—তার পোশাকে কি রক্তের দাগ ছিল ?

—না, রক্তের দাগ আমি দেখিনি।

—তাকে কি চঞ্চল মনে হয়েছিল ?

—না, অন্যদিনের মতোই শান্ত ছিল।

এরপর হাজির করা হয় বেনারসীকে। তার বিবরণ নিম্নরূপঃ—

—'আমি জনাব জোয়ান বখ্‌তের আরদালি ছিলাম। ১১ই মে সকাল নয়টা থেকে আমার ডিউটি ছিল। সকাল নয়টার কিছু আগেই আমি বখ্‌ত সাহেবের লালকুয়াস্থ বাসায় যাই। আমার আগে পাহারায় ছিল ফতেহ্ আলি।

'আমি কাজে গেলে ফতেহ্ আলি বাসায় চলে যায়। বারোটা পর্যন্ত আমি পাহারায় নিযুক্ত ছিলাম। ভোলা সিং আমার পরে ডিউটিতে যায়। বারোটায় বাড়ি যাওয়ার সময় মোগল বেগকে আমি সেখানে দেখেছিলাম।'

—তার পোশাকে কি কোন রক্তের দাগ ছিল ?

—না! কোনো রক্তের দাগ আমি দেখিনি।

—ওই দিন যখন তুমি লালকুয়ার বাড়িতে যাও তখন কি হিমু ও আশরাফ সেখানে ছিল ?

—হিমুকে আমি দেখেছিলাম। আশরাফকে দেখিনি।

মোগল বেগের বিবরণ অনুযায়ী যাদের আদালতে হাজির করা হয় তাদের মধ্যে

একজন বাদে আর সবাই স্বীকার করে যে, মোগল বেগকে তারা বখ্‌ত সাহেবের লালকুয়ার বাসায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দেখেছিল। যে দ্বিমত পোষণ করেছিল সে বলেছিল দেড়টার সময় দেখেনি। কারণ কিছুক্ষণ আগে সে চলে গিয়েছিল। মোগল বেগও তার জবানবন্দীকে একই কথা বলেছিল। দেড়টা পর্যন্ত থাকার দাবী সে করেনি।

ওদিকে সরকারী সাক্ষীদের বিবরণে প্রকাশ পেয়েছিল যে মোগল বেগ নিজ হাতে সকাল নয়টা থেকে দশটার মধ্যে ইংরেজ সাহেবদের হত্যা করেছিল।

দু'পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে এতো গরমিল থাকা সত্ত্বেও বিচারক মোগল বেগকে কঠোর শাস্তি দেন। বিচারের রায়ে তিনি বলেন,—

—'দিল্লীর শাহী মহলের লাহোর গেটের অনতিদূরে যে দ্বিতল বিশিষ্ট প্রাসাদটি রয়েছে তার অভ্যন্তরে এবং নিন্মদেশে ১৮৫৭ সালের ১১ই মে তারিখে যেসব ইংরেজ নর-নারীকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল আজ তা ইতিহাসের এক করুণ হৃদয়বিদারক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ব্রিটিশ সরকার গেজেট থেকে ক্যাপ্টেন ডগলাস, সাইমন, ফ্রেজার, পাদরী জেনিংস এবং মি, হাসিনসনের নাম বাদ দিয়েছে। আজ চার বছর পর সেসব নিহতদের মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব নয়। তার কোনো প্রয়োজন আছে বলেও আমরা মনে করি না। প্রত্যেকটি সাক্ষী চোখে দেখা ঘটনার বিবরণ দিয়েছে। মোগল বেগ যে হন্তাদের নেতা ছিল, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সেই যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল নিঃসন্দেহে তা প্রমাণিত হয়েছে।'

'সাক্ষীদের সম্বন্ধে বলা যায়, এদের অধিকাংশই ক্যাপ্টেন ডগলাসের চাপরাশি কিংবা আরদালি ছিল। সে কারণে সঠিকভাবে সবকিছু অবলোকন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাই তাদের বিবৃতির উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে। তারা দীর্ঘ চার বছর পরে দেশীয় বন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না।'

'জাঠমল চাপরাশি কিংবা আরদালি ছিল না। তবে যেহেতু সে প্রসাদের সাথে চাকরিসূত্রে জড়িত ছিল সেহেতু তার বক্তব্য গ্রহণ করা অযৌক্তিক নয়।'

'তবে, বিভিন্ন সাক্ষীর বক্তব্যে কিছুটা গরমিলও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তা গুরুতর কিছু নয়। সে জন্যে আসল ঘটনার সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের অসুবিধা হয়নি। তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা কিংবা বানোয়াট বলেও প্রমাণিত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সাক্ষী বখতাওর সিংহ বলছে,—'মিঃ ডগলাস ও মিঃ হাসিনসনকে হত্যা করার সময় মহারাজ সিংহ সেখানে উপস্থিত ছিল।' অন্যান্য সাক্ষীর বিবরণেও কিছুটা হেরফের হয়েছে। সবার বিবরণ ঠিক কাঁটায় কাঁটায় মেলেনি। তবে তাই বলে মূল ঘটনা নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিবৃতি বিবরণ সত্য থেকে সরে গেছে, বিকৃত হয়েছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যে চার চারটা বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সামান্য ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক।'

'মোগল বেগ প্রথম দিক ছিল সম্রাট বাহাদুর শাহের আরদালী। পরে তাঁর ছেলে জোয়ান বখ্‌তের আরদালি হয়। উজির মাহবুব আলী খানের আরদালি কাজও সে করেছিল। ফলে প্রাসাদে কর্মরত অন্যান্য আরদালির কাছে সে ছিল পরিচিত। বরং বেশি

পরিচিত ছিল। সাক্ষীরাও ব্যক্তিগতভাবে বন্দীকে চিনতো। এতো সবের পরে ভুল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'বন্দী অবশ্য নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করেছে। তাকে মোগল নামে পরিচিত বিলায়েত আলীর সাথে ভুল করা হয়েছে বলে আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু সাক্ষীদের জবানবন্দীতে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এতো চেনা জানার মধ্যে ভুল হওয়া সম্ভব নয়।'

'১১ই মে অনুষ্ঠিত ঘটনার সময় মোগল বেগ প্রাসাদে উপস্থিত ছিল না বলে জানিয়েছে। কোথায় সে কথাও বলেছে। কিন্তু এতোগুলো সাক্ষী কি করে ভুল করতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। সুতরাং মিঃ ফ্রেজার, ক্যাপ্টেন ডগলাস, মিঃ জেনিংস এবং মিস ক্লিফোর্ডের হত্যার অপরাধে এই বন্দী মোগল বেগকে আমরা দোষী সাব্যস্ত করছি। তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যার জন্য আদেশ দিচ্ছি। তার অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আরো আদেশ দেওয়া হচ্ছে, তাকে লাহোর গেটের সামনে খোলা মাঠে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসি দেওয়া হোক। এদেশের মানুষ তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করুক। এমন মরণ খেলায় আর যেন কেউ মেতে না ওঠে।'

সাক্ষীদের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে বিচারক যতো সাফাই করেন না কেন, তার নিজস্ব রায়ের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে জনসাধারণ কিছুতেই নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। মোগল বেগের আবেদন অনুযায়ী যদিও তিনি কয়েকজন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করার ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও তাদের বক্তব্যে মোগল বেগের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, তবু বিচারক সে সবের প্রতি সামান্যতম গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

তিনি কয়েকজন সাক্ষীকে আদালত হাজির করার ব্যবস্থা করেছিলেন সে সম্বন্ধে আলোকপাত করেন নি তার রায়ে। অথচ মোগল বেগের নিয়োজিত সাক্ষীদের কথায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছিল যে, মোগল বেগকে তারা আগে থেকেই চিনতো। ঘটনার দিনে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সবাই তাকে বখ্‌ত সাহেবের লালকুয়ার বাসায় দেখেছিল। তার পরিধানে ছিল স্বাভাবিক পোশাক। রক্তের দাগ কোথাও ছিল না।

এমতবস্থায় কি করে একপক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে একজন মানুষকে প্রকাশ্য স্থানে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় তা সত্যি দুর্বোধ্য।

মোগল বেগ তার নামে গন্ডগোলের যে প্রশ্নটা আদালতে উত্থাপন করেছিল সেটা অনেকখানি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাক্ষীরা বলেছিল,—'মোগল বেগ ছিল মাহবুব আলী খানের এক সময়ের আরদালী।' আর মোগল বেগ বেলেছিল,—'সে কখনো মাহবুব আলী খানের আরদালী ছিল না।' তার আরদালী ছিল মোগল, গন্ডগোল হয়তো সেখানেই। কিন্তু সে কথা স্বীকার করলে কিংবা তার প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা দেখালে সমগ্র ব্যাপারটাই পণ্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ, মোগল বেগ নামে পরিচিত ব্যক্তি তখন মৃত। উল্লেখিত অন্যান্য আসামীও পরপারে। তাই সেব্যাপারে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। অথচ বিপ্লবের সময় পাইকারী হত্যার বিচার চার বছর পরে করতে গেলে এমন ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে নামের সেখানে এতো মিল রয়েছে।

ব্যাপারটা ছিল আসলে অন্যরকম। বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকারকে আর তার নিযুক্ত বাহিনীকে এদেশের এতো বেশ সংখ্যক নিরপরাধ নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা, বিতাড়ন আর নিঃশেষ করতে হয়েছিল যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সেই নিষ্ঠুরতাকে চাপা দেওয়ার জন্য, ইতিহাসকে নতুনভাবে সৃষ্টি করার অভিপ্রায় তারা এমনি দু'চারটা বিচার সভায় আয়োজন করেছিল। বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চেয়েছিল এদেশের মানুষকে স্বাধীনতার চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ভবিষ্যতের জন্য নিষ্কণ্টক হতে।

তাই কি হয় ? আঘাতে মানুষ শক্ত হয়, দুর্বিণীত হয়। দুর্বার হয় তার প্রতিশোধ স্পৃহা। নতুন করে আবার ঝাঁপিয়ে পরে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গক্রমে আরেকটা বিচারের বিবরণ উদ্ধৃত করতে চাই। তাহলে ইংরেজ বিচারকদের মানসিকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করার প্রয়োজন হবে না।

ঘটনাটা ঘটেছিল আগ্রা শহরে। বিচারও হয়েছিল সেখানে। এবার বিচারপতি ইংরেজ হলেও আসামী ভারতবাসী ছিল না। আসামী ছিল খোদ বিলেতী সাহেব। নাম এডভোকেট ফুলার। ঘটনাচক্রে আসামীর কাঠগড়ায় তাকে হাজির করতে বাধ্য করেছিলেন আগ্রার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট নিডস্। আগ্রা শহরের সাধারণ মানুষ কাক পাখির মতো সহমর্মিতা দেখিয়েছিল একজন সহিসের প্রতি। ক্রমান্বয়ে তাদের সংখ্যা ও উত্তেজনা এতোই বেড়ে গিয়েছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিচারের ওয়াদা না করে পারেন নি। অবশ্য ঘটনাটা অনেক পরের। দেশ তখন শান্ত।

ঘটনাটা খুলেই বলা যাক।

এডভোকেট ফুলার আইন ব্যবসা করতেন আগ্রা শহরে। তিনি খাস ইংরেজ হলেও তার বাসার চাকর-বাকর, সহিস, খানসামা সব ছিল দেশীয়। এছাড়া উপায়ও ছিল না। বিলেত থেকে কেউ আসতো না বাসার চাকর কিংবা গাড়ির সহিস হতে। যারা আসতো তারা অশিক্ষিত হলেও দেশে কোনো কাজ করতো না।

এডভোকেট ফুলারের সহিসের নাম ছিল কাতবারু। বড় সরল প্রকৃতির শক্ত সমর্থ বিশ্বস্থ কর্মচারী ছিল সে। এক রোববারে হঠাৎ করে সাহেবের খেয়াল হলো গীর্জায় যাওয়ার। হাতে তখন সময় বেশি ছিল না। তার গাড়ি থাকতো বাসা থেকে বেশ দূরে। সহিস কাতবারুও থাকতো সেখানে। গীর্জায় যাবার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফুলার চাকরকে পাঠালেন সহিসের কাছে। গাড়ি নিয়ে আসতে বললেন তাড়াতাড়ি। চাকর যখন সেখানে পৌছালো, সহিস তখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ছিল বাথরুমে। তাই চাকরকে বললো,—'ভাই, গাড়িতে ঘোড়া জোড়াই আছে, তুমি একটু কষ্ট করে নিয়ে যাও। সাহেব বসতে থাকুন। আমি এলাম বলে।'

চাকরটা তাই করলো। ফুলার সাহেব গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলেন নির্দিষ্ট আসনে কাতবারু নেই। আছে বাসার চাকর ভীমচাঁদ। রাগে আগুন হয়ে গেলেন তিনি। সহিসের না আসার কারণ জানতে চাইলেন। ভীমচাঁদ আসল ঘটনা জানালো। সাহেবের রাগ আরো বেড়ে গেল। মেজাজ গেল বিগড়ে। ঠিক সেই সময় হন্তদন্ত হয়ে কাতবারু হাজির

হলো গাড়ির কাছে। ব্যস্ততার সাথে বসতে গেল নিজের আসনে। আর যায় কোথায় ? এডভোকেট ফুলার চুল ধরে নামিয়ে আনলেন তাকে নীচে। তার নাকে-মুখে অজস্র ঘুষি মেরে পরীক্ষা করতে লাগলেন বাহুবল। ঘটনার আকস্মিকতায় সহিস তো বেয়াকুব। দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগলো সে। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলো না। কোনো কৈফিয়তও দিলো না।

শিক্ষিত ইংরেজ গুন্ডাটার কাণ্ড দেখে রাস্তার লোকজন চলা বন্ধ করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কেউ কিছু বলতে সাহস পেলো না। এতে সাহেবের সাহস গেল বেড়ে। আঘাতের পর আঘাত করতে লাগলো বেচারা সহিসের মাথায়। নাক মুখ কেটে রক্ত ঝরতে লাগলো সহিসের। সহ্য করতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেল সে মাটিতে।

এবার আরম্ভ হলো পায়ের শক্তির পরীক্ষা। নিদারুণভাবে পদাঘাত করতে লাগলো সে সহিসের কুঁকড়ে যাওয়া দেহে। সহিসের জ্ঞান বিলুপ্ত হবার পর যেন ফিরে এলো তার জ্ঞান। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সময় প্রায় নিঃশেষ। চাকরের সাহায্যে গাড়ি চালিয়ে গেলেন তিনি গীর্জায়। জ্ঞানহীন কাতবারু পড়ে রইলো রাস্তায়। মানবতাকে পদানত করে গেলেন তিনি ধর্ম পালনে।

এডভোকেট ফুলারের প্রস্থানের পর পথচারীরা এগিয়ে গেল কাতবারুর কাছে। আহত সহিসকে সমবেদনা জানাবার জন্য তার গায়ে হাত দিতেই তারা বুঝলো সাহেবের বুটের আঘাতে অনেক আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে বেচারার।

অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা চলে গেল গন্তব্য পথে। কিন্তু আগ্রার সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারলো না। তারা মুহূর্তে খবরটা ছড়িয়ে দিলো শহরময়। চোখের সামনে এমনি করে একজন নিরীহ নিরাপরাধ বিশ্বস্ত গরীব মানুষের সমবেদনায় শত শত মানুষ জড়ো হলো ফুলার সাহেবের বাসার সামনে। চরম উত্তেজিত তারা। কপালে যা থাকে, ফুলারের বাড়ি আক্রমণ করবে। প্রতিশোধ গ্রহণ করবে অন্যায়—অত্যাচারের।

খবর পৌঁছে গেল ম্যাজিস্ট্রের লিডসে্র কানে। ছুটির দিনের বিশ্রামকে হারাম করে ছুটে এলেন তিনি ঘটনাস্থলে। শান্ত হতে অনুরোধ করলেন বিক্ষুব্ধ জনতাকে। বললেন,—'এমনি ধরনের অরাজকতা চলেছিল কোম্পানী রাজত্বে। এখন খোদ মহারাণীর রাজত্ব কায়েম হয়েছে। আমরা সহ্য করবো না এ জাতীয় অন্যায়। উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা হবে। আপনারা শান্ত হোন। আমি সহিসের লাশ পাঠাচ্ছি হাসপাতালে। ময়না তদন্ত হবে সেখানে। তারপর সরকারের পক্ষ থেকে কেস করা হবে এডভোকেটের বিরুদ্ধে। ইংরেজ বলে তাকে ক্ষমা করা হবে না। আইন তার নিজস্ব পথেই চলবে। একটা অন্যায়ের প্রতিকার করতে গিয়ে আরেকটা অন্যায় আপনারা করবেন না। মৃত কাতবারুর পক্ষে সরকার সবকিছু করবে। আপনারা যারা নিজের চোখে ঘটনাটা দেখেছেন, দয়া করে তারা আসবেন আদালতে। সত্যি সাক্ষ্য দেবেন ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে। আমাদের সাহায্য করবেন এদেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে।'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আশ্বাসবাণীতে আগ্নেগিরির আগুনের মতো ক্ষিপ্ত জনগণ শান্ত হলো। ঘরের মানুষ ঘরে ফিরে গেল। এইভাবে সুকৌশলে লিকস্ আগ্রার উষ্ণ হাওয়াকে

লঘু করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য তার কথা তিনি রেখেছিলেন। এডভোকেট ফুলারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছিল আদালতে। আশান্বিত মানুষ দল বেধে এসেছিল সাক্ষী দিতে। সবার সাক্ষী গ্রহণ করা যায়নি। বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়নি সাক্ষীদের কাছে।

প্রশ্নের নমুনা ছিল নিম্নরূপঃ-

—তুমি কাতবারুকে আগে থেকে চিনতে ?

—চিনতাম।

—সে তোমার আত্মীয় ছিল ?

—না, বন্ধু ছিল।

—সে কি প্রায়ই অসুস্থ থাকতো ?

—না। বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান ছিল।

—ফুলার সাহেব তাকে মেরেছিলেন কেন ?

—ঠিক জানি না।

—তিনি যখন মেরেছিলেন তখন কি তোমার মনে হয়েছিল যে, কাতবারু মারা যেতে পারে ?

—না, মনে হয়নি।

—আচ্ছা, তুমি যাও।

দ্বিতীয় সাক্ষীকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ-

—ফুলার সাহেবকে তুমি কতোদিন ধরে চেনো ?

—জানি না।

—কাতবারুকে তিনি মেরেছিলেন কেন ?

—সময় মতো গাড়ি নিয়ে আসেনি বলে।

—তোমার সামনেই কি ফুলার সাহেব সহিসকে মেরেছিলেন ?

—জ্বি, আমার সামনেই।

—তুমি সাহেবকে বাধা দিয়েছিলে ?

—না।

—আচ্ছা তুমি যেতে পারো।

এইভাবে সরকারী উকিল যেসব প্রশ্ন সাক্ষীদের করেন তাতে তিনি পরোক্ষ যেন আসামীকেই সমর্থন করছিলেন। সেসব প্রশ্নোত্তরের রেশ ধরে আসামী পক্ষের উকিল আদালতে প্রমাণ করেন যে, আসলে ফুলার সাহেব কাতবাবুকে তেমন মারাত্মক আহত করেনি। সাক্ষীরা সামনে থাকা সত্ত্বেও বাধা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। যে কোনো মনিব চাকর-বাকরে মাঝে মধ্যে এমন একটু আধটু মার ধোর করেই থাকে। কাতবাবু আসলে ছিল অসুস্থ। দীর্ঘদিন থেকে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছিল। পিলেটা তার বেড়ে গিয়েছিল অস্বাভাবিকভাবে। সামান্য আঘাতেই তাই তার মৃত্যু হয়েছিল। প্রমাণ হিসেবে তিনি আদালতে উপস্থাপন করেছিলেন ময়না তদন্তকারী ডাক্তারের রিপোর্ট। পরে উকিল ডাক্তারকেও জিজ্ঞাসবাদে করেন। ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন,—

—ফুলার সাহেবের সহিসের লাশ কি আপনি নিজেই পোস্ট মর্টম করেছিলেন ?

—হ্যাঁ আমি নিজ হাতেই করেছিলাম।

—লাশের দেহে মারাত্মক কোনো আঘাতের চিহ্ন কি আপনি দেখেছিলেন ?

—না, তেমন কিছু নজরে পড়েনি।

—তা হলে সে মারা গেল কেন ?

—আগে থেকেই হয়তো সে রোগগ্রস্ত ছিল। তার পেটের পিলেটা অস্বাভাবিক রকম বড় ছিল।

—তাতে কী মনে হয় ?

—মনে হয়, সে খুব দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। সামান্য আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা তার ছিল না। পিলেটাও তার ফাটা পাওয়া গিয়েছিল।

—পিলে ফাটার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন ?

—এডভোকেট সাহেব হয়তো রাগের মাথায় তাকে ধাক্কা দিয়েছিলেন। দুর্বলতার কারণে সে হয়তো তাল সামলাতে পারেনি। পড়ে গিয়েছিল। তাতেই বৃহৎ পিলেটায় আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যায়। তার ফলেই বেচারার করুণ মৃত্যু হয়।

—ফুলার সাহেব তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন বলে কি আপনার মনে হয় ?

—না, অমন একটু আধটু আঘাত আমরা চাকর-বাকরদের নির্বুদ্ধিতার জন্য দিয়ে থাকি। হত্যার উদ্দেশ্যে নয়।

—আপনি বলেছেন আঘাত মোটেই মারাত্মক ছিল না!

—জ্বি, প্রকাশ্যে রাস্তায় একটা লোককে হত্যা করে কোনো ধর্মপ্রাণ মানুষ নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে উপাসনালয়ে যেতে পারে না।

—অন্য সাক্ষীরা যে বলছে, ফুলার সাহেব কিল ঘুষি মেরে কাতবারুদ নাক দিয়ে রক্ত ছুটিয়ে দিয়েছিলেন ?

—তেমন রক্তের দাগ আমি দেখিনি। তার দেহে কোথাও জখমের চিহ্নও ছিল না।

—আচ্ছা, আপনি আসতে পারেন।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল, যারা মনে করেছিল তাদের স্পষ্ট বক্তব্যে বিচারক কঠোর সাজা দেবেন আসামীকে। ডাক্তারের কথা শুনে তারা হতাশ হলো। নিজেদের নিবুর্দ্ধিতার জন্য অনুশোচনা করলো। তাদের মনে হলো, একটা পরাধীন দেশের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসী হয়ে ইংরেজ ডাক্তার, ইংরেজ উকিল আর শ্বেতাঙ্গ বিচারকের নিকট থেকে ন্যায্য বিচার আশা করা দূরাশা। তারা কিছুতেই একজন হতভাগ্য সহিসের হত্যার অপরাধে সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এডভোকেটকে শাস্তি দেবে না। দিতে পারে না। বিচারের নামে সেদিন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাদের ধোকা দিয়েছিলেন। তাই তারা ইংরেজ বিচারকের রায় শোনার জন্য অপেক্ষা না করেই আদালত কক্ষ ত্যাগ করেছিল।

বিচারক তার সুচিন্তিত রায়ে বলেছিলেনঃ—'সামান্য আঘাতে সহিসের মৃত্যু হয়েছিল বলে অভিজ্ঞ মেডিকেল অফিসার যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। মানুষের দেহ এবং বেঁচে থাকার ক্ষমতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ

ডাক্তারের চাইতে নির্ভুল ভাবে আর কেউ বলতে পারে না। প্রত্যক্ষদর্শীরা সবাই কাতবারুর বন্ধু, না হয় পরিচিত। তারা নিরপেক্ষ সাক্ষ্য দিয়েছে বলে মনে হয় না। অভিযুক্ত ফুলার সাহেবের আঘাত সম্বন্ধে তারা যা বলেছে, ডাক্তারের রিপোর্টে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তবে ফুলার সাহেবের ধাক্কায় কাতবারু যে পড়ে গিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুস্থ মস্তিষ্কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ফুলা'র সাহেব তাকে ধাক্কা মারেন নি। রাগ ঝেড়েছিলেন মাত্র।'

'ফুলার সাহেব একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। গীর্জায় যেতে দেরী হবার কারণে রাগ হাওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য কাতবারুই দায়ী। তার কর্তব্য-অহেলার জন্যই এমনটি হয়েছিল। তাই আদালত আসামীর অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ত্রিশ টাকা জরিমানা করছে। সে টাকা মৃত সহিসের বিধবা স্ত্রী পাবে।'

এমনি ছিল সেদিনকার ইংরেজ বিচারকের রায়। সত্যিকার বিচার তখন হতে পারতো না। সাজা যা পাওয়ার তা নির্ধারিত ছিল ভারতবাসীর জন্য। কথায় কথায় ফাঁসিতে ঝোলানো হতো তাদেরই। সেজন্য সাক্ষ্য প্রমাণের দরকার হতো না। অভিযোগ বিশ্বাস করার সামান্যতম কারণ থাকলেই হলো।

আট

সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম ধাক্কায় লাখ্নো ইংরেজ মুক্ত হয়েছিল। বিস্তর ক্ষয়ক্ষতির পর ইংরেজ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লী পতনের পর ইংরেজরা সামরিক শক্তি সংহত করে। বিশ্বাসঘাতক শিখ সৈন্যদের আনুগত্যের মাধ্যমেই তা সম্ভব হয়। দিল্লীতে পাশবিক হত্যা চালিয়ে তারা বিশাল ভারতের অন্যত্র বিদ্রোহ দমনে যাত্রা করে। পুনর্দখল করে প্রায় সব কয়টি খোয়ানো অঞ্চল। সে সময়কার একটি মর্মান্তিক ঘটনা উল্লেখ করেন তৎকালীন তিরানব্বই নম্বর হাইল্যান্ডার্স-এর অন্যতম সার্জেন্ট ফরবেস মিচেল। তাঁর জবানীতেই সেই হৃদয় বিদারক কাহিনীটি শোনাতে চাই—

—"লাখনৌ পুনরাধিকারের জন্যে যাত্রা করার সব ব্যবস্থাই সম্পন্ন হয়েছে। কানপুরে থেকে ভোরে আমাদের যাত্রা করতে হবে। বিলেত থেকে নতুন করে সৈন্য-সামন্ত ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এসেছে আমাদের অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে। এবার আমরা পরাজিত হতে চাই না। পথ চলার সময় প্রথমে থাকবে সীজ ট্রেন, তারপর এমিউনিশন পার্ক আর সবশেষে থাকবো আমরা।'

'সারাদিনের ডিউটি শেষ করে বিশ্রামের জন্যে কেবল তাঁবুতে ফিরেছি, এমন সময় খবর এলো জ্যামী গ্রিন নামে যে লোকটা গত ক'দিন যাবত ক্যাম্পে ক্যাম্পে কেক ফেরি করছিল, সে আসলে গুপ্তচর। একজন ভারতীয় বন্দী তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। বন্দীটি গায়ে পড়েই কাজটা করেছে। নিজে মুক্তি পাওয়ার আশায় হয়তো করেছে। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও মারাত্মক অভিযোগ আছে। বেরিলীতে বিদ্রোহের সময় সে তার ইংরেজ মনিবকে হত্যা করেছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে ধরা পড়েছে। ফাঁসির আসামী সেও। শুধু আদেশের অপেক্ষা। প্রত্যেক-দিন সারা জীবনের ইংরেজ আনুগত্যের বয়ান করতো। সে প্রমাণ করতে চাইতো তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্যি নয়।'

'বড় দুঃখ হয় জীবনে বাঁচার তাগিদে সে নিজের বিবেককে বিক্রি করে দিয়েছিল। শুধু ফাঁসির কবল থেকে রেহাই পাওয়া জন্যে সে জ্যামী গ্রিনকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ফাঁস করে দিয়েছিল জ্যামী গ্রিন-এর সত্যিকার পরিচয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেও বাঁচতে পারেনি। পরে তাঁকেও ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। বিশ্বাসঘাতকতার সাজা তাকে ভোগ করতে হয়। হয়তো তাকেও আরেকজন মিথ্যে করে ধরিয়ে দিয়েছিল।'

আমার দুঃখ, নিজের নির্দোষিতা ও ইংরেজ-প্রীতির প্রমাণ দিতে গিয়ে তার দেশের একটা মহামূল্য জীবনকে অকালে ঝরিয়ে দিতে তার বুক কাঁপেনি। সে সময় নিজে

বাঁচবার জন্যে কিংবা আমাদের কৃপা লাভের আশায় বেশ কিছুসংখ্যক দেশবাসী স্বদেশীর সাথে বেঈমানী করেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তারাও বাঁচতে পারেনি। বেঈমানেরা সবারই ঘৃণার পাত্র। স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে অনেক সময় তাঁদের কাজে লাগানো হয় ঠিকই, কিন্তু তাঁদের বিশ্বাস করা হয় না। যে উদ্দেশ্যে তারা বেঈমানী করে তা সব সময় সফল হয় না।

জ্যামী গ্রিনের ধরা পড়ার খবরটা আমাকে আনন্দ দিতে পারেনি। কারণ ইতিমধ্যে তাঁর সাথে আমার কয়েকবার কথা হয়েছিল। তাঁর ব্যবহারে আমি মোহিত হয়েছিলাম। তার অনবদ্য স্বাচ্ছন্দ্য ইংরেজী কখন আমাকে বিস্মিত করেছিল। তাকে গুপ্তচর হিসেবে ভাবতে আমার কষ্ট হয়েছিল। তার বিশুদ্ধ ইংরেজী বচন শুনে প্রথমদিন আমি প্রশ্ন করেছিলাম,—'এতো সুন্দর ইংরেজী তুমি শিখলে কি করে ?' সে বলেছিলে,—'আমার পিতার একটা বিলেতী রেজিমেন্টের মেসে খানসামার কাজ করতেন। আমি তাঁর সাথেই থাকতাম। ছোটবেলা থেকে তাই সাহেবদের সাথে ইংরেজীতেই কথাবার্তা বলতে হতো। তারা সবাই আমাকে স্নেহ করতেন। রেজিমেন্টের স্কুলেই আমি লেখাপড়া করেছি। বন্ধুত্ব ছিল ইংরেজ ছেলে-মেয়েদের সাথে। পরবর্তীকালে মেসের হিসাব রাখার দায়িত্বও আমাকে পালন করতে হয়েছিল। এসব কারণে ভালো ইংরেজী শেখা আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল। কিন্তু আব্বার অবসর গ্রহণের পর আমাকে ফিরে যেতে হয় নিজ গ্রামে। অবস্থার অবনতি ঘটে। তবু যা ছিল, যুদ্ধের সময় তাও শেষ হয়ে গেছে। বাধ্য হয়ে এখন ফেরী করে খাচ্ছি। আর কোনো আয়ের পথ তো এখন আমাদের জন্যে খোলা নেই।'

'লোকটার কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম। প্রয়োজন না থাকলেও প্রত্যেকদিন তাঁর নিকট থেকে কেক কিনতাম। অবকাশ থাকলে গল্প করতাম। বিলেত থেকে সদ্য আসা খবরের কাগজ সে পড়ার জন্যে চাইতো। বিনা দ্বিধায় আমি তাঁকে দিতাম। সে খুব খুশী হতো। সেসব কাগজে যুদ্ধের খবরাখবর থাকতো। থাকতো সরকারের নীতি আর আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থার ইঙ্গিত। সিভিলিয়ানদের সেসব দেখানোর কথা নয়। কিন্তু লোকটাকে আমার ভালো লাগতো বলে দিতাম। কোনো সন্দেহ হতো না। তাই তাঁর গোয়েন্দা হিসেবে ধরা পড়ার খবরটা আমাকে আঘাত দিয়েছিল সবচাইতে বেশী। আমি জানতাম, গোয়েন্দার একমাত্র শাস্তি ফাঁসি। তবু মনে প্রশ্ন জেগেছিল, সত্যিই কি তাঁকে মারা হবে ? কোনো প্রমাণ কি সংগ্রহ করা হবে না ? অন্যের ব্যাপারে যা হয়েছে তাঁর ব্যাপারেও কি তাই হবে ? বিনা বিচারে ফাঁসি দেওয়া হবে জ্যামী গ্রিনকে ?'

'জ্যামী গ্রিনের প্রতি যখন আমি খুব সহানুভূতিপ্রবণ তখনই কয়েকজন প্রহরী তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এলো। বললো,—'ব্রিগেডিয়ারের অফিস তেকে একে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। আপনার জিম্মায় থাকবে সে সারারাত। ভোরে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে। এতো রাতে মেজর সাহেব ঝামেলা করতে চান না।'

আমি তাদের প্রশ্ন করলাম,—'জ্যামী সত্যিই যে গুপ্তচর তার প্রমাণ কি ?'

—জ্যামীর একজন পরিচিত লোকই একথা বলে দিয়েছে।

—সে লোকটা যে সত্যি বলেছে, তা তোমরা বুঝলে কেমন করে ?

—মেজর সাহেব অনেকক্ষণ ধরে জ্যামী গ্রিনকে জেরা করেছেন। ওই লোকটার কথাই ঠিক। জ্যামী আসলে ফেরীওয়ালা নয়। সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম থেকেই সে শত্রু পক্ষের সাথে ছিল। না হলে শিক্ষিত লোক হয়ে মিলিটারিদের মধ্যে কেক ফেরি করবে কেন ?

—বলো কি ?

—বিশ্বাস না হয় আপনি জিজ্ঞেস করে দেখবেন। সে নিজের অপরাধ মেজর সাহেবের নিকট স্বীকার করেছে। সকালেই তাঁর ফাঁসি হবে। এখন আমরা বাজারে যাবো কিছু শূকরের মাংস আনতে।

—কেন ? শূকরের মাংসে কি হবে।'

—ওঁকে খাওয়াতে হবে। ধর্মের জন্যে নাকি ওরা বিদ্রোহ করেছিল। মৃত্যুর আগে তাই শূকরের কাঁচা মাংস খাইয়ে ওর ধর্ম নষ্ট করতে চায়।'

'ওদের কথা শুনে আমার মেজাজ গরম হলো। ধমক দিয়ে বললাম,—

—'ফাজলামো ছাড়ো। বাড়াবাড়ি করলে তোমাদেরই আমি গ্রেফতার করবো। কড়া শাস্তি দেবো। জ্যামী এখন আমার তাবেদারে। তাঁকে যা করতে হয় আমিই করবো। তোমরা যাও। সকালে নিয়ে যেয়ো, সারা রাত আমি জেগে তাঁকে পাহারা দেবো।'

'ওরা চলে গেলো। এবার আমি জ্যামীর দিকে তাকালাম। সেও তাঁর ভাসাভাসা চোখ দু'টো করুণ অথচ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার মুখের ওপর তুলে ধরলো। ভারি সুন্দর তাঁর চেহারা। সবল-সুঠাম দেহ। কাঁচা হলুদের মতো রঙ। মিশকালো মাথার চুল। শুধু চোখ দু'টো বন্দী হরিণীর মতো ছলছল। বড় করুণা হলো আমার। তাঁর হাতের বেড়ি খুলে দিলাম। তারপর তাঁকে বসার আসন দিয়ে বললাম,—'কী শুনছি এ সব ?'

—আমার পরিচিত এক ভারতবাসীই মেজর সাহেবকে বলেছে।

—আমিও শুনেছি। সে কি সত্যিকথা বলেছে ?

—আপনার কী মনে হয় ?

—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—আমি আপনাকে মিথ্যে বলবো না। বরং মৃত্যুর আগে আমার সব-কথা আপনাকে জানিয়ে যাবো। সৃষ্টিকর্তার অসীম মেহেরবাণী যে, আপনার মতো একজন হৃদয়বান ব্যক্তির সাথে আমার জীবনের শেষ কথা হবে। শূকরের গোস্ত খাওয়া থেকে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। খোদা আপনার মঙ্গল করবেন।

আমি বললাম,—'সারারাত ধরে তোমার কথা শুনবো। তার আগে বলো, তোমার জন্য আপততঃ আমি কী করতে পারি ?'

সে বললো,—'আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। আমি ভয়ানক ক্লান্ত। খিদে থাকলেও খাওয়ার ইচ্ছে নেই। শুধু নামাজ পড়তে চাই। এক ঘটি অজুর পানি দিলেই হবে।'

আমি তার অজুর পানির ব্যবস্থা করলাম। বাজারে লোক পাঠালাম মুসলমানী খাবার আনার জন্যে। জ্যামী গ্রিনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে তাঁকে নিয়ে আমি বসলাম।

জিজ্ঞেস করলাম,—'সত্যিই কি তুমি গুপ্তচর ? গোপন খবর নেওয়ার জন্যেই কি তুমি ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে এখানে এসেছিলে ?'

—'গুপ্তচর বলতে যা বোঝায় আমি ঠিক তা নই। কার জন্যে আমি গোয়েন্দাগিরি করবো ? এখন কি আর আমাদের নেতা আছে ? সবারই তো বিষদাঁত ভাঙ্গা। কার ক্ষমতা আছে, আপনাদের গোপন খবর নিয়ে কাজে লাগানোর ? সব তো শেষ হয়ে গেছে। আপনাদের বর্তমানে যে শক্তি সামর্থ্য তা নিয়ে লাখ্নো দখল করা কঠিন কিছু নয়। কেউ আপনাদের বিজয়কে ঠেকাতে পারবে না। তবে স্বাধীনতা প্রিয়রা হয়তো বাধা দেবে। হয়তো মোকাবেলার করবে, কিন্তু জীবন বিসর্জন দেওয়া ছাড়া কিছুই হবে না। যে উদ্দীপনা আর উৎসাহ নিয়ে দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল, দিল্লী অধিকার করেছিল, তা যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতো, সঠিক নেতৃত্ব বিদ্রোহী সিপাহীরা পেতো, আমাদের মানুষরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করতো তবে কি আপনারা দিল্লী দখল করতে পারতেন ? এতোদিনে সাগর পাড়ি দেয়ে আপনাদের দেশে ফিরতে হতো। আমাদের দোষেই আমরা সুযোগ নষ্ট করেছি। জানি না আবার কবে সুযোগ আসবে। সেদিন যদি একই ভুল দেশবাসী না করে, তবে আপনাদের পরাজয় হবে নিশ্চিত। স্বাধীনতার নতুন সূর্য আবার ভারতের আকাশে উদিত হবে। এখন গোয়েন্দাগিরি করে লাভ নেই। যখন লাভ ছিল তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সংগ্রামে জয়লাভও করেছিলাম। কিন্তু একতার অভাবে, দেশবাসীর বেঈমানীর কারণে সে বিজয়কে স্থায়ী করতে পারিনি। আজ আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকারে পরিণত হতে হলো।'

—তুমি যে গুপ্তচর নও সে কথা মেজর সাহেবকে বলোনি কেন ?

—বলেছিলাম। তিনি বিশ্বাস করেন নি। ওই বেঈমানটার কথামতোই আমাকে ফাঁসির আদেশ দিলেন। ভোরে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে বলে জানালেন। জানি না, ওই মিথ্যাবাদিটার ফাঁসি কবে হবে! এই বেঈমানীর জন্যে মেজর সাহেব তাকে মুক্তি দিলেও খোদার কাছে সে দায়ী থেকে যাবে। রোজ হাশরের মাঠে তাকে কৈফিয়ৎ দিতেই হবে।

—তুমি কি মনে করো লাখ্নৌ পুনর্দখল করা আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না ?

—কঠিন হতো, যদি আমি গতকাল চলে গিয়ে সব খবর তাদের দিতে পারতাম। আপনাদের গোপন খবর আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। ভাগ্য মন্দ, তাই লোকটা আমাকে দেখে ফেললো। মেজর সাহেবের কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করলো।

—তোমার পরিচয় এখনো কিন্তু আমার জানা হয়নি। তোমার আসল পরিচয় কি ? সেটা গোপন করেছিলে কেন ?

—আমি একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। এক সময়কার চীফ ইঞ্জিনিয়ার।

—আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার ?

—জ্বি, প্রথমদিন আমাকে মিথ্যে বলার জন্যে ক্ষমা করবেন। সত্যি বলার উপায় থাকলে আপনাকে মিথ্যে বলতাম না। রোহিলাখণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম।

আমার নাম মুহম্মদ আলী খান। পৃথিবীর সেরা সত্যবাদীর নামে সাথে মিল রেখে আব্বা আমার নাম রেখেছিলেন। কিন্তু আপনারা বাধ্য করেছিলেন আমাকে মিথ্যের আশ্রয় নিতে। খোদা আমাকে মাফ করবেন।

—কোথায় পড়াশুনা করেছিলেন আপনি ?

'তার জীবনকথা জানার আগ্রহ বেড়ে গেলো আমার। মুহম্মদ আলী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন,—'বেরিলী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে পাশ করে আমি রুরকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হই। সেখানে বহু ইংরেজ ছেলে আমার সহপাঠী ছিল। প্রতিযোগিতায় কেউ আমার সাথে পেরে উঠতো না। বরাবরই আমি প্রথম হতাম। ফাইনাল পরীক্ষায় সিভিল ও মিলিটারী উভয় বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে রেকর্ড মার্ক পেয়ে আমি প্রথম হই। আশা করেছিলাম একটা ভালো চাকরি পাবো। সাহেবরা আমার প্রতিভার মর্যাদা দেবেন। কিন্তু আজ অতি দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, তারা আমার প্রতি অবিচার করেছিলেন। কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে সর্বনিম্নে পদে আমাকে নিয়োগ করা হয়। বস্ হিসেবে যাকে আমি পাই, সে ছিল একটা আস্ত অসভ্য। লেখাপড়া জানতো না। ইংল্যাণ্ডে থাকলে সে বড়জোর একটা মিস্ত্রী হতে পারতো। অথচ সে গায়ের জোরে আমাকে দাবিয়ে রাখতো। পশুসুলভ ব্যবহার করতো। সে সময় ইংরেজ অফিসারদের মধ্যে যে সব দোষ দেখা যেতো সবগুলোই তার মধ্যে ছিল। কিন্তু কোনো ভালো অফিসারের গুণ সে পায়নি। তার উদ্ধত অসৌজন্যমূলক ভণ্ডামি, অপমানকর আচরণ আমার অসহ্য মনে হতো। বড় আশা নিয়ে কোম্পানীর চাকরিতে ঢুকেছিলাম। কিন্তু ওই একটা মাত্র অসভ্য লোকের জন্যে আমার সকল আশায় ছাঁই পড়লো। আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেশের বাড়িতে চলে গেলাম।'

'সারা নিশীথ জাগরণে আমার সাথী ফাঁসির আসামী মুহম্মদ আলী এমনি করে তাঁর ব্যথাহত জীবনে করুণ কাহিনী শুনিয়েছিলো। শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছিল, গায়ের জোরে এমনি করে কতো প্রতিভাকে আমরা নষ্ট করেছি। ভালবাসার পরিবর্তে ঘৃণা আর দুর্ব্যবহারে অনুগত সিপাহীদের বিদ্রোহ করতে বাধ্য করেছি। বিশাল দেশের সম্ভ্রান্ত জমিদার-মহাজন, রাজা-বাদশাহদের শত্রুতে পরিণত করেছি। পরোক্ষ তাদের উসকানি দিয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে, প্রতিশোধ গ্রহণে নিষ্ঠুর হতে। আজকের বিদ্রোহের জন্য যতো না ওরা দায়ী তার চেয়ে বেশি দায়ী আমরা, আমাদের কর্মকর্তা আর কর্মচারীরা।'

'প্রতিভাবান ইঞ্জিনিয়ার মুহম্মদ আলী জীবন কাহিনী এখানেই শেষ নয়। কোম্পানী তাঁর প্রতিভা আর কর্মক্ষমতার দাম না দিলেও তিনি যথাযথ মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁর বিদ্রোহী মনকে তিনি কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তাই হয়তো ফাঁসির আদেশে তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। আমার সাথে বিশুদ্ধ স্বচ্ছন্দ ইংরেজিতে সারারাত ধরে গল্প করতে পেরেছিলেন। সকালে নির্ঘাত মৃত্যু জেনেও তিনি সামান্যতম বিচলিত হন নি। বলেছিলেন,—'মুজাহিদ জীবনের পরিণতি গাজী অথবা শহীদ। গাজী হতে পারলাম না। শহীদে আপত্তি থাকবে কেন ?'

'কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে তিনি লাখ্নৌ চলে যান। আযোধ্যার নবাব নাসিরউদ্দিনের দরবারে চাকরি নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাব পরিবারের উপর চালাচ্ছে বেআইনী জুলুম। অমানবিক অত্যাচার। নবাব বাহাদুর কোম্পানীর কর্মচারিদের বিরুদ্ধে বিলেতের ডাইরেক্টর বোর্ডে অভিযোগ পেশ করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী খুঁজছেন। মুহম্মদ আলী আযোধ্যার নবাব বাহাদুরের সাথে গেলেন বিলেতে। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস তাঁর স্বদেশের মাটিতে যে তিরানব্বই নম্বর হাইল্যাণ্ডার্স বাহিনীর হাতে তিনি বন্দী, যারা বিনা বিচারে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলাবে, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে শারীরিক অত্যাচার চালিয়েছে সেই নাইনটি থি হাইল্যান্ডার্স বাহিনীই বিলেতের এডিনবার্গে অযোধ্যার নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে তাঁকেই গার্ড অব অনার দিয়েছিল।'

'ভারতে ফিরে আসার পর নানা সাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে আবার যেতে হয়েছিল বিলেতে। অভিযোগ পেশ করতে হয়েছিল লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু ১৮৫৫ সালে বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে খালি হাতে। তখনই তাঁর মন নতুন করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে। আজিমউল্লাহ খাঁ এবং আরো কতিপয় ইংরেজী শিক্ষিত দৃঢ়চেতা দেশপ্রেমিকের সাথে একমত হয়ে কোম্পানী রাজত্বের অবসান ঘটানোর জন্যে দেশব্যাপী প্রচারণা চালানোর কাজে নেমে পড়েন। সিপাহী বিদ্রোহের পেছনে তাদের গোপন প্রচারণা যথেষ্ট কাজ করেছিল।'

'কথার মাঝে আমি মুহম্মদ আলীকে প্রশ্ন করেছিলাম,—'আপনি কোম্পানী রাজত্বের অবসান চাচ্ছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে উঠিয়ে নিচ্ছেন, অবসান ঘটাচ্ছেন কোম্পানী রাজত্বের। মৃত্যুর আগে আপনি জেনে যেতে পারলেন আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।' উত্তরে মুহম্মদ আলী বলেছিলেন,—তা ঠিক। পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা অনেক অনেকটা ভালো। এখন আর যথেচ্ছাচার করতে পারবে না কর্মকর্তারা। ভারতবাসীর দুভোর্গ হয়তো কিছুটা কমবে। কিন্তু আমি তো এটা চাইনি। আমি চেয়েছিলাম পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। স্বশাসিত দেশ। কোম্পানীর পরিবর্তে পার্লামেন্টে এলেও বৃটিশ শাসনই তো থাকলো। তবু আমার উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হয়েছে বলতে হবে। অসমাপ্তটুকু পূরণ করবে অনাগতেরা। তা হলে আমার আত্মা শান্তি পাবে, আত্মাহূতি সার্থক হবে।'

'আমি জ্যামী গ্রিনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—'বিপ্লবী দলের নেতা হিসেবে তো কাজ করেছিলেন। কানপরের হত্যাযজ্ঞের সময় কি আপনি সেখানে ছিলেন?' উত্তরে জ্যামী বলেছিলেন, 'না, আমি তখন দেশের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের রাখতে গিয়েছিলাম। যেখানে বসেই মীরাট ও বেরিলীর বিদ্রোহের খবর পাই। আমরা এমনটিই চাচ্ছিলাম। ফলে দেরী না করে পরিবার পরিজন থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে যাই বেরিলীতে। যোগদান করি বেরিলী ব্রিগেডে। তারপর দিল্লী। সহজেই অধিকৃত হয় ঐতিহ্যবাহী দিল্লী নগরী। প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সরকার। আমাকে করা হয় চীফ ইঞ্জিনিয়ার। অন্যান্য

ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে গড়ে তুলে দিল্লী রক্ষা ব্যবস্থা। তবু কেন দিল্লীর পতন হয়েছিল তা তো আপনার জানা আছে। দিল্লী পতনের পর আমরা মথুরার দিকে যাত্রা করি। তখন আমাদের সাথে ত্রিশ হাজার সৈন্য। যমুনা পারে জন্য যে নৌ-সেতু তৈরী করা হয়েছিল সেটা আমারই কীর্তি।'

'লাখ্‌নৌতে আসার পরও আমাকে চীফ ইঞ্জিনিয়ার করা হয়। সেখানে কেমন রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলাম তাও আপনার অজানা নয়। নভেম্বর পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছিলাম ইংরেজ বাহিনীকে। কিন্তু বিনা যুদ্ধে একজন ইংরেজকেও আমরা হত্যা করিনি। নিরপরাধের রক্তে রঞ্জিত করিনি আমাদের হাত। তবু নতুন ইংরেজ বাহিনী সেখানে গিয়েই বইয়ে দিয়েছিল রক্তের বন্যা, হত্যা করেছিল অগণিত নিরীহ মানুষকে।'

'যখন আমাদের পতাকাদণ্ড থেকে সবুজ পতাকা নামিয়ে আপনাদের বিজয় পতাকা উড়ানো হচ্ছিল তখন দূর থেকে আমার বুক দুমড়ে গিয়েছিল। শরীরের স্পন্দনও থেমে যাচ্ছিলো। দেহের রক্ত হিম শীতল হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, আশার আলো নিভে গেলো।'

'এইভাবে সারারাত ধরে জ্যামী গ্রিনের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। রাত্রি জাগরণে আমি এতাটুকু ক্লান্ত হইনি। বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সঠিক ইতিহাস আমি শুনেছিলাম তাঁর মুখে। তাঁকেও এতোটুকু বিচলিত হতে দেখিনি। একবার শুধু সামান্য সময়ের জন্যে তাঁর কণ্ঠ ভারী হয়ে এসেছিল। মনের অলক্ষ্যে আমার চোখের পাতাও বুজে গিয়েছিল। তিনি তখন বলেছিলেন,—'মিচেল সাহেবের মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু দুঃখ হচ্ছে ভারতের সেরা ইঞ্জিনিয়ারে সবার অলক্ষ্যে গ্রামের এই নির্জন স্থানে ভোর বেলায় গাছের ডালে ঝুলবে। মৃতদেহের সৎকার হবে না। কেউ জানতে পারবে না। আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে কেউ বলবে না, তাদের প্রাণপ্রিয় পিতার ভাগ্যে কী ঘটেছে।'

'অবশ্য পর মুহূর্তেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিলেন,—'ফরাসী দেশের ইতিহাস আমি পড়েছি। ফ্রান্সের বিপ্লবী বীর 'ডান্টনের'র কথা এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে। তাঁর মতোই আমাকে শক্ত হতে হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। আমি দুর্বল হবো না। আপনি সাক্ষী, মৃত্যুভয়ে আমি ভীত নই।'

'তাঁর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কথা মনো হলো। আমার বুকভাঙা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সেই মুহূর্তে। এমনি সময় দূর থেকে ভেসে এলো ফজরের আজানের ধ্বনি। জ্যামী গ্রিন বললেন,—'সময় ঘনিয়ে এসেছে। ঘাতকেরা এসে যাবে। আপনি দয়া করে আমার জীবনের শেষ নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করুন। আমি অজু করবো।'

'আবারো অজুর পানি এনে দিলাম। পাকপবিত্র হয়ে অনেকক্ষণ ধরে তিনি নামাজ পড়লেন। লম্বা মোনাজাত করলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—'খোদা আপনার ভালো করবেন। বিদায় বন্ধু, বিদায়।' ইতিমধ্যে মেজর সাহেবের প্রহরীরা এসেছিল। মনের অনিচ্ছায় মুহম্মদ আলীকে তাদের হাতে সপে দিলাম। হাতকড়াটা পরিয়ে দিলাম নিজ হাতে।'

‘সকালে গোজগাজ করতে খানিকটা বেলা হলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী সীজ ট্রেন চলে গেছে আগে। পরে গেছে এমিউনিশন পার্ক। তারপর যাত্রা করলাম আমরা। সারারাত জেগেছিলাম। বিছানায়ও দেহ এলাতে পারিনি। তবু নিজেকে এতোটুকু ক্লান্ত মনে হলো না। সারারাত মুহম্মদ আলী যেখানে বসে গল্প করেছিলো, বিদায়ের সময় সেই শুন্য স্থানটার দিকে তাকালাম। তারপর কান্নায় আমার বুক ভেঙে গেল। নেমে পড়লাম রাস্তায়। যাত্রা করলাম মুহম্মদ আলীর মতো দেশপ্রেমিকদের পরাজিত করতে। পর্যুদস্ত করতে তাদের শৌর্য-বীর্য।’

‘লাখ্নৌর রাস্তা ধরে চলেছি। পথের পাশে একটা ঝাঁকড়া গাছের দিকে হঠাৎ নজর গেলো। দেহটা শিউরে উঠলো। দেখলাম, আমার গত রাতের বন্ধু ভারতবর্ষের সেরা ইঞ্জিনিয়ার, আদর্শ দেশপ্রেমিক দৃঢ় আত্মপ্রত্যায়ের প্রতীক মুহম্মদ আলীর প্রাণহীন দেহ গাছের ডালে ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে। চোখে পানি ধরে রাখতে পারলাম না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম, মনে মনে উচ্চারণ করলাম,—‘মে গড্স পীজ বী আপন হী।’

❑